প্রথম রাজ্য কাউন্সিল সভার আহ্বান

রাজ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে জীবন-জীবিকার অভিজ্ঞতার নিরিখে নিজ নিজ ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করুন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন পরবর্তী প্রথম স্টেট কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয় ৫ এপ্রিল সংগঠনের কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে। রাজ্য কাউন্সিল সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সভাপতি মানস দাস এবং ওপর দুই সহ সভাপতি পিকু ব্রহ্ম ও জয়দেব হাজরাকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভার শুরুতে শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

সংগঠনের অন্যতম সহ সভাপতি পিকু ব্রহ্ম। রাজ্য কাউন্সিল সভায় প্রারম্ভিক প্রস্তাবনা রাখেন সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। সাধারণ সম্পাদক তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্যে বলেন, বিশেষ পরিস্থিতিতে এবার দু'দিনের পরিবর্তে একদিনের কাউন্সিল সভা করতে হচ্ছে। রাজ্য সম্মেলন পরবর্তী এই মধ্যবর্তী সময়ে আমাদের ২২টি সমিতির রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফলে এই কাউন্সিল সভায় অনেক নতুন সদস্য যুক্ত হয়েছেন। একটা বিশেষ সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে যখন আমরা রাজ্য কাউন্সিল সভা করছি, এই সময়ে দাঁড়িয়ে আমাদের যে সাফল্য এবং যে দায়িত্ব আমরা রাজ্য সম্মেলন থেকে গ্রহণ করেছিলাম, সেটা রূপায়ণ সহ আগামীদিনে আমাদের যা করণীয়, সাংগঠনিক অস্তিত্ব রক্ষার যে পরীক্ষার সম্মুখীন আমরা হয়েছি, সেখানে দাঁড়িয়ে পথনির্দেশ ঠিক করবার জন্য এই কাউন্সিল সভা। ২১তম রাজ্য সম্মেলনের একেবারে প্রাথমিক কিছু পর্যালোচনা কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় করা হয়েছে। এই সময়ে দাঁড়িয়ে নদীয়া জেলা যেভাবে এই সম্মেলনের আয়োজন করেছে তার জন্য অভ্যর্থনা কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা পাঠানো হয়েছে। বিভিন্ন জেলা, অঞ্চল এবং সমিতিগুলোর পক্ষ থেকেও অভিনন্দন জানানো হয়েছে। কিন্তু সব জেলা, অঞ্চল বা সমিতি যে এই দায়িত্ব পালন করেছে সে দাবি আমরা করতে পারি না। আমরা বিংশতিতম সম্মেলন থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম যে প্রশাসনের অভ্যন্তরে যে অনিয়মিত, চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী রয়েছেন তাঁদের সংগঠিত করা প্রয়োজন, নদীয়ার একবিংশতিতম সম্মেলনে সে সিদ্ধান্ত আমরা অনেকটাই রূপায়িত করতে পেরেছি। একটি অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে, তাঁদের নিয়ে সভা করা হয়েছে। এবার এই পশ্চিমবঙ্গ চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী সমন্বয় কমিটির অ্যাডহক টীমের প্রতিনিধিদেরও রাজ্য কাউন্সিল সভায় যুক্ত করা হচ্ছে। বিগত সম্মেলন থেকে পঞ্চাশ হাজার সদস্য সংগ্রহের যে সিদ্ধান্ত সংগঠন গ্রহণ করেছিল, এই সম্মেলন থেকেও সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সমিতি এবং কো-অর্ডিনেশন কমিটি যদি পারস্পরিক সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে নিজেদের ত্রুটি দুর্বলতাগুলোকে চিহ্নিত করে সেই ত্রুটি দুর্বলতা কাটিয়ে তোলার আন্তরিক চেষ্টা করে তবে এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হওয়া সম্ভব। আমাদের কর্মচারীদের কাছে পৌঁছোতে হবে। আজকে মানুষকে যেভাবে বিভাজন করা হচ্ছে, যেভাবে মানুষকে কাজের লাইনে দাঁড় করাবার পরিবর্তে এস আই আর-এর লাইনে দাঁড় করানো হচ্ছে, সারাক্ষণ একটা আশঙ্কার মধ্যে রেখে দেওয়া হচ্ছে, এর মোকাবিলায় একেবারে রাজনৈতিক এজেন্ডা নিয়ে আমাদের যেতে হবে। রাজ্য সম্মেলনের পরবর্তী সময়ে ২৩-২৬ জানুয়ারী মহারাষ্ট্রের শিরডি শহরে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের ১৮তম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে সেখানে ২৭জন প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ১৬-১৯ ফেব্রুয়ারী সদস্যভুক্তির যে আহ্বান ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে রাখা হয়েছিল তার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও রূপায়ণের ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা গেছে। ৫ ফেব্রুয়ারী সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, তার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে যৌথ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ১২ ফেব্রুয়ারী ২ ঘণ্টার কর্মবিরতি, ২৬ তারিখের 'কালিঘাট চলো' আন্দোলন কর্মসূচী। ২৬ তারিখের 'কালিঘাট চলো' কর্মসূচী কলকাতায় ১২টা থেকে এবং উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে ছুটির পর অনুষ্ঠিত হয়েছে। এটা নিছক কর্মসূচী ছিল না, আমরা বারবার কর্মসূচীকে আন্দোলনে রূপান্তর করার যে কথা বলতাম, 'কালিঘাট চলো' আক্ষরিক অর্থেই ছিল আন্দোলন। চারঘণ্টা ধরে ধর্মতলা চত্বর সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে রাখার মতো ঘটনা স্মরণাতীত কালে ঘটেনি। এই আন্দোলন কর্মচারী আন্দোলনের ইতিহাসে একটা নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। এখান থেকেই আহ্বান জানানো হয় ১৩ মার্চের ধর্মঘটের। এই ধর্মঘট আর পাঁচটা ধর্মঘট থেকে পৃথক। এই ধর্মঘট রাষ্ট্রের নির্দেশকে কার্যকর করার দাবিতে ধর্মঘট। এবারের ধর্মঘটে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়ে প্রতিরোধের ধর্মঘটে পরিণত হয়েছে। আমরা সর্বত্র পিকেটিং করেছি। বহু জায়গায় শাসকের তরফে আক্রমণ নেমে এসেছে। আক্রমণ প্রতিরোধ করেই ধর্মঘট হয়েছে। কর্মচারীর কাছে পৌঁছাতে পারলে যে তার ইতিবাচক ফল পাওয়া সম্ভব হয়, ২৬ ফেব্রুয়ারীর 'কালিঘাট চলো' কর্মসূচী এবং ১৩ মার্চের ধর্মঘট তার প্রমাণ। অধিকার সম্প্রীতি জাঠাও এর প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই আন্দোলনের আঁচ প্রশাসনের কাছেও পৌঁছেছে। আমরা দেখতে পেলাম মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, অর্থদপ্তরের মহার্ঘভাতা প্রদানের আদেশনামা। মহার্ঘভাতা প্রদান, তার পরিমাণ, হিসেবের পদ্ধতি নিয়ে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। সংগঠন দায়িত্ব সহকারে পরিস্থিতির ওপর সতর্ক নজর রাখছে, তথ্য সংগ্রহ করছে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে চিঠিও দেওয়া হয়েছে। আন্দোলনের সাথে সাথে পারসুয়েশনের ওপরও জোর দিতে হবে। ১৫ এপ্রিল ইন্দু মালহোত্রা কমিটির মিটিং-এর পর আগামী আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাথে সাথে সমিতিগুলোকেও উদ্যোগ নিতে হবে।

এই মুহূর্তে আমরা এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের সামনে এক বড়ো রাজনৈতিক সংগ্রাম। আসন্ন রাজনৈতিক সংগ্রামকে সামনে রেখে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মত বিনিময় করার লক্ষ্যে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের কর্মচারী আবাসন সহ বাড়ি বাড়ি

দেবব্রত রায়

প্রচারে যেতে হবে। ১২ই জুলাই কমিটির গৃহীত কর্মসূচী অনুযায়ী পথসভা, মিছিল সংগঠিত করতে হবে। কলকাতায় 'জনচেতনা মঞ্চের' ব্যানারে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচীতে উপস্থিত হবে। ১২ই জুলাই কমিটির লিফলেট, বুলেটিন, সংগ্রামী হাতিয়ারের বিশেষ সংখ্যা, সমিতিগুলির বিশেষ সংখ্যা কর্মচারীদের কাছে দ্রুত পৌঁছে দিতে হবে। নির্বাচন কর্মী হিসেবে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। একইসাথে অভিজ্ঞতার নিরিখে নির্বাচক হিসেবেও সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করে রাজ্যে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের যুক্ত করতে হবে। পরিবার পরিজনদের সচেতন করার ক্ষেত্রে প্রত্যেককে সদর্থক ভূমিকা পালন করতে হবে।

২১তম রাজ্য সম্মেলনের মঞ্চ থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তের সাথে সাযুজ্য রেখে চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের সমকাজে সমবেতন ও নিয়মিত কর্মচারীদের মতো সুযোগ-সুবিধা প্রদান, নিয়মিতকরণ, শূন্যপদে স্বচ্ছতার সাথে স্থায়ী নিয়োগ সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দাবিতে তাৎক্ষণিক কর্মসূচী নেওয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদানে অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও বিভাজনের বিরুদ্ধে কর্মচারীদের সংগঠিত করে আন্দোলনে যুক্ত হতে হবে। পয়লা মে শ্রমিক সংহতি দিবস যথাযথ মর্যাদায় পালন করতে হবে।

ডি এ নিয়ে বঞ্চনার প্রতিবাদে আগামী ৯ বা ১০ এপ্রিল রাজ্যের সর্বত্র টিফিন বিরতিতে কর্মচারী জমায়েত করে বিক্ষোভ সভা করতে হবে।

কাউন্সিল সভায় জেলা, অঞ্চল, সহযোগী সমিতি মিলিয়ে মোট ২৭ জন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। জবাবী বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায়।

কাউন্সিল সভায় উপস্থিত ছিলেন ১৪৫ জন। □

দীপঙ্কর বাগচী

বকেয়া মহার্ঘ ভাতা/রিলিফকে কেন্দ্র করে অর্থ সচিবকে প্রদত্ত পত্র

মাননীয়
অতিরিক্ত মুখ্য সচিব
অর্থ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মহাশয়,

আপনি অবহিত আছেন যে, সম্প্রতি মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীসহ পেনশনারদের বকেয়া মহার্ঘভাতা / রিলিফ অবিলম্বে মিটিয়ে দেবার জন্য রায় দান করেছেন এবং এই রায় কার্যকরী করার জন্য বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার নেতৃত্বে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করে দিয়েছেন। এই কমিটি সামগ্রিক বিষয়টি পর্যালোচনার দায়িত্বে আছেন। সম্প্রতি বকেয়া মহার্ঘভাতা / রিলিফ প্রদানের জন্য অর্থ দপ্তর থেকে তিনটি আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে।

এই তিনটি আদেশনামার বেশ কিছু অসঙ্গতি নিয়ে আমরা ইতিমধ্যেই আপনাকে (পত্রাঙ্ক নং : Co-ord 29/26 তাং 24-03-2026) পত্র মারফৎ অবহিত করেছি। উক্ত আদেশনামাগুলির (পত্রাঙ্ক নং: 996-F (P_2) তাং 13-03-2026, 997-F (P_2) তাং 13-03-2026 এবং 998-F(P_2) তাং 13-03-2026), প্রথম দুটির ২ নং প্যারার (i) উপধারায় উল্লেখিত ছিল যে জানুয়ারি 2016 থেকে ডিসেম্বর 2019 পর্যন্ত সময়কালের AICPI অনুযায়ী বকেয়া মহার্ঘভাতা দুটি সমান কিস্তিতে যথাক্রমে মার্চ, ২০২৬ এবং সেপ্টেম্বর, ২০২৬ এর মধ্যে মিটিয়ে দেওয়া হবে।

কিন্তু গত ২৬.০৩.২০২৬ তারিখ অর্থ দপ্তরের (পত্রাঙ্ক নং : 1086-F (P_2) তাং 23-03-2026) আদেশনামায় বলা হয়েছে যে AICPI (100% neutralization) অনুযায়ী জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ সময়কালে বকেয়া মহার্ঘভাতা ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণ মিটিয়ে দেওয়া হবে। অর্থ দপ্তরের এই আদেশনামা রাজ্য সরকারের শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীসহ পেনশনার মহলে চূড়ান্ত বিভ্রান্তি ও ক্ষোভ তৈরি করেছে। অর্থ দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী প্রথম কিস্তির প্রদেয় অর্থ এই সময়কালে সামগ্রিক বকেয়া বলে ঘোষিত করা হলো কিনা তা নিয়ে সংশয় দেখা দিচ্ছে। আমরা অবিলম্বে এই ব্যাপারে অর্থ দপ্তর থেকে তথ্যপূর্ণ সুস্পষ্ট অবস্থান প্রকাশ করতে অনুরোধ করছি।

৩১ মার্চ ২০২৬ এর মধ্যে প্রথম কিস্তির অর্থ কর্মচারীদের একাংশের কাছে পৌঁছে যাওয়ার বার্তা গেলেও রাজ্য সরকারের অধীনস্থ ওয়ার্ক-চার্জড কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এখনো পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি। অবিলম্বে এই অংশের কর্মচারীদের বকেয়া প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করছি।

আমরা পূর্ববর্তী পত্রে জানিয়েছিলাম যে GTA-এর অধীনস্থ সরকারী কর্মচারী / পেনশনাররা HRMS-এর অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় তাদের বকেয়া মহার্ঘভাতা / রিলিফ পাওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আমরা দাবি জানাচ্ছি যে, GTA-এর অধীনস্থ কর্মচারী / পেনশনারদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা/ রিলিফের অর্থ অবিলম্বে প্রদান করতে হবে। একই সঙ্গে আমরা দাবি জানাচ্ছি গ্রান্টস-ইন-এইড এর অধীনস্থ সমস্ত অংশের শ্রমিক-কর্মচারী / পেনশনারদের বকেয়া মহার্ঘভাতা / রিলিফ এর অর্থ দ্রুত প্রদানে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক। এছাড়াও সরকারের অধীনস্থ বিভিন্ন বোর্ড ও কর্পোরেশনের কর্মচারীদের এই সময়কালের বকেয়া মহার্ঘভাতা / রিলিফ অবিলম্বে প্রদান করতে হবে।

২০১৬ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে যারা অবসর গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে একাংশ কর্মচারীর HRMS থেকে তথ্য অবলুপ্তি হয়ে যাওয়ায় কর্মরত সময়কালের বকেয়া অর্থ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য অনুরোধ করছি।

সামগ্রিক বিষয়গুলি নিয়ে আমরা আপনার সাথে সাক্ষাতে বিস্তারিত আলোচনা করতে আগ্রহী। দ্রুত সময় ও তারিখ নির্ধারণের অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে,

ভবদীয়,
বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী
(বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী)
[সাধারণ সম্পাদক]

সংগঠনের পক্ষ থেকে কলকাতা এলাকার পেনশন প্রাপকদের বকেয়া মহার্ঘ রিলিফ সমস্যাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, অর্থ দপ্তরকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।
স্মারক নং ঃ কো-অর্ডি/৩২/২৬ তারিখ ঃ ০৫.০৪.২০২৬

কর্মচারী স্বার্থে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আদেশনামা

১। No. 5916(62)-F dt. 05.08.1981—Statement of Promotion Policy.

দ্বিতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্য সরকারের কর্মচারীর স্বার্থে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বিধানসভায় পেশ করা হয় ২০ এপ্রিল, ১৯৮১ সালে। ২৭ মে, ১৯৮১ সালে কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ সংক্রান্ত আরও বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

পরবর্তীতে কর্মচারীদের পদোন্নতি সংক্রান্ত আরও বেশ কিছু সুপারিশ এই আদেশনামায় প্রকাশিত হয়।

সব ধরনের কর্মচারীদের জন্য প্রথমেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে কোনো কর্মচারীই যে পদে চাকরিতে নিযুক্ত হয়েছিলেন, সেই পদেই চাকরি থেকে অবসর নেবেন না। পদোন্নতির জন্য সমস্ত সার্ভিস এবং ক্যাডারে পদ বৃদ্ধি করা হয়।

এই আদেশনামা অনুযায়ী সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে পদোন্নতির হার ৩০% থেকে বৃদ্ধি করে ৪০% করা হয়। আর সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার থেকে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের পদে পদোন্নতির জন্য ১৫% পদ রিজার্ভ করা হয়।

স্টেট সিভিল সার্ভিস থেকে প্রতিটি জেলায় ১টি করে এ.ডি.এম. পোস্ট নির্দিষ্ট করা হয় পদোন্নতির জন্য।

সাব-অর্ডিনেট সার্ভিস থেকে জুনিয়ার সার্ভিস-এ পদোন্নতির কোটা ৬০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে

প্রণব কর

৭৫ শতাংশ করা হয়। সাব-অর্ডিনেট থেকে স্টেট সার্ভিস-এ পদোন্নতির কোটা করা হয় ৪০ শতাংশ।

১ থেকে ১৩ নং পদে কর্মরত কর্মচারীরা যাদের বিগত ১৮ বছর কোনো পদোন্নতি হয়নি তাদের পরবর্তী উচ্চতর পদে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

গ্রুপ-ডি কর্মচারী পদের এক-তৃতীয়াংশ পদকে পরবর্তী উচ্চতর স্কেলে উন্নীত করা হয় (গ্রেড-১)। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করা গ্রুপ-ডি পদের কর্মচারীদের জন্য LDA / LDC পদের ১০ শতাংশ পদোন্নতির জন্য আলাদা করা হয়।

২। No. 6060-F dt. 25.06.1979—Appointment, Probation & Continuation Rule.

এই আদেশনামাটি ১৯৬৭ সালে লাগু হওয়া টেম্পোরারি, কোয়াসি পার্মানেন্ট এবং পার্মানেন্ট স্ট্যাটাস—এই তিন ধরনের সার্ভিসের বদলে সব সার্ভিসে নিযুক্ত কর্মচারীদের একেবারে কনফার্ম করার নির্দেশ দেয়। পূর্ববর্তী সময়ে অনেকে টেম্পোরারি বা কোয়াসি

● সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

সংগ্রামী হাতিয়ার
মার্চ-এপ্রিল, ২০২৬
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র
তেপান্নতম বর্ষ □ একাদশ-দ্বাদশ সংখ্যা □ মূল্য ঃ ৪ টাকা

সম্পাদকীয়

‘দড়ি ধরে মারো টান...’

রাজ্যের অষ্টাদশ বিধানসভার নির্বাচনের সামনে দাঁড়িয়েছি আমরা। এই নির্বাচন আগামী পাঁচ বছরের জন্য আমাদের নিয়োগকর্তা কে হবে তা নির্ধারণ করবে। রাজ্য সরকারী কর্মচারী হিসাবে এই নির্বাচন শুধুমাত্র আমাদের চাওয়া-পাওয়ার হিসাব বুঝে নেওয়ার নির্বাচন নয়। আমাদের চাকরিগত দাবি দাওয়ার বাইরেও, আমাদের পরিবারের প্রিয় মানুষগুলোর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান সহ আশেপাশের সামাজিক বিন্যাস কীরকম হবে তা নির্ধারণ করে। সোজাসাপ্টা বলতে গেলে আমাদের প্রত্যেকের ভবিষ্যৎ জীবনে একটা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাব থাকবে এই নির্বাচনের। এর পূর্বেও রাজ্যে ১৭টি বিধানসভা নির্বাচনকে আমরা রাজ্যের কর্মচারী সমাজ প্রত্যক্ষ করেছি। যদিও ব্যক্তি কর্মচারী হিসাবে প্রাকৃতিক কারণেই আজকের দিনের কর্মচারী সমাজের এই অভিজ্ঞতা থাকার কথা নয়। আজকের দিনে কর্মচারী, অর্থাৎ আমাদের মতো কর্মচারীরা প্রায় কমবেশি প্রত্যেকেই বিগত শতকের শেষ দশক থেকে বর্তমান সময়ের মধ্যেই রাজ্য প্রশাসনে নিয়োজিত হয়েছেন। তাই ব্যক্তি হিসাবে আমাদের অভিজ্ঞতার ঝুলিও সীমাবদ্ধ। আজকের দিনে এই কথাগুলি আমরা বলছি কেন? কারণ এই সীমাবদ্ধতা শুধুমাত্র ব্যক্তি হিসাবে আমাদের অভিজ্ঞতা নয়, সীমাবদ্ধতা রয়েছে আমাদের ভবিষ্যৎ, আমাদের চাওয়া-পাওয়ার ক্ষেত্রেও। একজন সরকারী কর্মচারী হিসাবে আমরা যেমন কিছু সাংবিধানিক অধিকার ভোগ করি, তেমনি আমাদের থাকতে হয় কিছু সাংবিধানিক বিধি নিষেধের মধ্যেও। তাই আমাদের আশেপাশের পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার থাকে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যে। কিন্তু দেশের একজন নাগরিক হিসাবে, নির্বাচক হিসাবে আমাদের নিজেদের পছন্দের বা পক্ষের সরকার গড়ার অধিকার রয়েছে। আর আজ তাই একজন নির্বাচন কর্মী হিসাবে নিরাপদ, নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার দায় যেমন আমাদের উপর রয়েছে, তেমনই নির্বাচক হিসাবে আগামী দিনের সরকার গড়ার ক্ষেত্রেও রয়েছে এক বিপুল দায়িত্ব। যে সরকার আমাদের জীবন-জীবিকা, পরিবারের প্রিয় মানুষগুলির ভবিষ্যৎ জীবনকে নির্ধারণ করবে, সেই সরকারের ভবিষ্যৎ আমাদেরই নির্ধারণ করতে হবে।

এতগুলি কথা বললাম শুরুতেই কারণ, আমাদের জীবনে প্রতিদিন তিন ধরনের লড়াই করি আমরা। প্রথমত ব্যক্তিগত স্তরে, দ্বিতীয়ত সমাজের সর্বকনিষ্ঠ সংগঠন অর্থাৎ পরিবারের অভ্যন্তরে, তৃতীয়ত সমাজের সর্ববৃহৎ সংগঠন, যে প্রতিনিয়ত আমাদের পরিবারগুলিকে আক্রমণ করে চলেছে অর্থাৎ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে। আর এই তিনটি স্তরের লড়াই করতে গিয়ে ব্যক্তির অভ্যন্তরে কার্যকরী থাকে বহু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়, যে সমস্যাগুলির সমাধান না ঘটিয়ে এই লড়াইয়ে জয়যুক্ত হওয়া সম্ভব হয় না। ব্যক্তিগত স্তরে একজন মানুষের এই লড়াইটা থাকে, তিনি ন্যায়-নীতি-আদর্শের পথে থাকবেন—নাকি সমাজের অভ্যন্তরের অনাদর্শের চটকদারি প্রলোভনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গড্ডালিকা প্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে দেবেন। সমস্ত প্রলোভনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজেকে সঠিক জায়গায় রাখাটাই হলো ব্যক্তিগত স্তরের লড়াই। এই লড়াইটাই আমাদের প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত করতে হচ্ছে, কারণ বিগত দেড় দশকে বাংলার সমাজে যে গুণগত পরিবর্তন হয়েছে তার মর্মে রয়েছে এই প্রসঙ্গটি।

শ্রেণী বিভক্ত সমাজে দুর্নীতি সমস্যার একটি উপসর্গ হিসাবে থাকে, কিন্তু বিগত দেড় দশকে কি বাংলায়, কি দেশে এই দুর্নীতি একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। তার চেয়েও সমস্যার দিক হলো এই দুর্নীতির সামাজিকীকরণ ঘটানো হয়েছে পরিকল্পিত ভাবে। ‘নির্বাচনী বন্ড’ গ্রহণ করাই বলুন, বা ‘তোয়ালে মুড়ে’, ‘স্যান্ডো পরে’, ‘আধ শোয়া হয়ে’, বা ‘ভদ্রমুখে ধন্যবাদ জানিয়ে’ ঘুষ নেওয়াটা এখন প্রতিদিনই অহরহ ঘটছে। তাই এত দুর্নীতির খবর প্রতিদিন প্রতিটি মানুষের সামনে আসলেও, এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে ক্ষোভ তৈরী হলেও দিনের শেষে এই ক্ষোভ থাকছে কি? দ্বন্দ্বটা এখানেই।

বিগত দেড় দশকে রাজ্যের শাসকের পক্ষ থেকে শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষকদের উপর প্রতিদিনই নেমেছে আক্রমণ, কখনও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, কখনও অধিকারের উপরে। আবার উল্টো দিকে কেন্দ্রের শাসকদল বিগত এক দশকে শ্রমআইনগুলিকে বাতিল করে ১ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে শ্রমিক বিরোধী ‘শ্রমকোড’ কার্যকরী করেছে। যে শ্রমকোডের মাধ্যমে দেশের শ্রমিকদের পাশাপাশি আক্রান্ত হবে মধ্যবিত্ত কর্মচারী সমাজও। এইরকম একটা সরকার যারা প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রায় সমগ্র দেশের সরকারী কর্মচারীদের পেনশন প্রকল্পকে প্রকৃতপক্ষে তুলে দিয়েছে। ত্রিপুরা, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ সহ দেশের যে প্রান্তেই রাজ্যের ক্ষমতায় এসেছে, সেখানেই প্রথম সুযোগে এই পেনশন প্রকল্প তুলে দেওয়ার পাশাপাশি স্থায়ী নিয়োগ বন্ধ করেছে। অথচ, রাজ্যের কর্মচারী সমাজের সামনে নিয়োগকর্তার নির্বাচনে মিডিয়ার পক্ষ থেকে এই দুটি শাসকদলের মধ্যেই বাইনারি তৈরী করা হচ্ছে। আমরা কী করব? দ্বন্দ্বটা এখানেও।

বাংলায় ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সমাজ সংস্কারের মুখ হলেন নবদ্বীপের চৈতন্যদেব। ‘চৈতন্য’ অর্থাৎ মেধার বিকাশ, সমাজের অভ্যন্তরে জাতিভেদকে উপড়ে ফেলে যিনি মানুষের প্রতি ভালোবাসাকেই উপরে তুলে ধরেছিলেন। সেই চৈতন্যদেব, লালন, রবিঠাকুর, নজরুলের বাংলায় আজ ধর্মের নামে, জাতের নামে বজ্জাতি দেখে কখনো কি মনে হচ্ছে মানুষের মধ্যে অবনমিত থাকা সুপ্ত সাম্প্রদায়িকতা তীব্রভাবে প্রকট হয়েছে? দ্বন্দ্ব এখানেও।

এরকম বহু দ্বন্দ্বই আজ রাজ্যের প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের মধ্যে ক্রিয়াশীল। এই দ্বন্দ্বগুলির সমাধান ঘটিয়েই তাকে প্রথমে নিজের পরিবার ও পরবর্তীতে সমাজের মধ্যে সঞ্চারিত করার লড়াইয়েই আমরা আজ রয়েছি। বিগত পাঁচ বছরে যে রাস্তার লড়াই আমরা করেছি প্রতিটি আক্রমণের বিরুদ্ধে, প্রতিটি প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে, সেই লড়াইয়ে আজ আর নিরপেক্ষ থাকার সুযোগ কতটুকু? তাই সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে রাজ্যের বুকে শ্রমিক-কর্মচারী সমাজের পক্ষের শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করার দায় আজ আমাদের সামনে। এই লড়াইয়ে জেতার মানসিকতাটাই আসল, হার না মানা লড়াইয়ের প্রত্যয় ঘোষিত হোক আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে। □

৭ এপ্রিল, ২০২৬

শোক সংবাদ

বিনয় ভট্টাচার্যের জীবনাবসান

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ বিনয় ভট্টাচার্য সম্প্রতি বিধান নগরে এক বেসরকারী হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি পশ্চিমবঙ্গ ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশনের প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দক্ষিণাঞ্চল-এর প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন।

বিনয় ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রেকর্ডস এন্ড সার্ভে ডাইরেক্টরেটে কর্মরত ছিলেন। চাকরি জীবনের শুরু থেকেই তিনি বামপন্থী মতাদর্শের কর্মচারী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। ৭০-এর দশকের জরুরি অবস্থা ও সংগ্রামী আন্দোলনের পথে থাকায় পদোন্নতির সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পদোন্নতি গ্রহণ করেননি। ২০০৮ সালের জুলাই মাসে তিনি সসম্মানে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার সাঁকো গ্রামে ১৯৪৮ সালের ১৪ জুলাই মামাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর শৈশব কাটে বর্ধমান জেলার রূপনারায়ণপুরে। তিনি যেমন মেধাবী ছাত্র ছিলেন তেমন খেলাধুলাতেও পারদর্শী ছিলেন, বিশেষ করে ফুটবল ও দৌড় বিভাগে।

ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি বামপন্থী মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। যুব আন্দোলনেও তাঁর ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সহজ সরল মনের অধিকারী। সদা হাস্য মানুষ ছিলেন। তাঁর অতি সাধারণ জীবনধারা বিশেষভাবে উদাহরণযোগ্য। সাধারণ গরিব মেহনতী মানুষের সুখ দুঃখের আমৃত্যু সাথী ছিলেন তিনি। তাঁর অমায়িক ব্যবহার ভীষণভাবে আকৃষ্ট করত তাঁর সহকর্মীদের। এলাকায় দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের মধ্যে একজন উদাহরণযোগ্য বামপন্থী মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন তিনি।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা, জামাতা ও নাতিদের রেখে গেছেন। □

রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনাবসান

গত ২৯ মার্চ, ২০১৬ বাংলা চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে। দীঘার কাছে তালসারি সমুদ্র সৈকতে ধারাবাহিক সিরিয়াল ‘‘ভোলে বাবা পার করেগা’’-র শুটিং করতে গিয়ে সমুদ্রের জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে। আধুনিক সময়ে বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওরফে বাবিন ১৬ অক্টোবর, ১৯৮৩ জন্মগ্রহণ করেন। ছিন্নমূল হয়ে পূর্ব বাংলা থেকে এসে তাঁর পরিবার আশ্রয় নেয় যাদবপুরের বিজয়গড় কলোনিতে। একেবারে শিল্পী পরিবারে বেড়ে ওঠা এই শিল্পীর বাবা বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ‘বিজয়গড় আত্মপ্রকাশ’ নাট্য দলের পরিচালক। সেই সূত্রেই মাত্র তিন বছর বয়সে মঞ্চে প্রথম পা রাখা, ‘রাজ দর্শন’ নাটকে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে শুরু আর তারপর দীর্ঘ পথ চলায় প্রায় ৪৫০টিরও বেশি নাটক মঞ্চে অভিনয় করেছেন তিনি। যা তাঁর শিল্পীসত্তার গভীরতা ও নিষ্ঠার প্রমাণ। রাহুলের দুই ভাই। বড় ভাই আয়ারল্যান্ডে থাকেন, এছাড়াও বর্তমানে ৭০ বছরের বৃদ্ধা মা, স্ত্রী ও পুত্র বর্তমান।

রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া হয় ‘‘চিরদিনই তুমি যে আমার’’ ছবির মধ্যে দিয়ে। পরবর্তী সময়ে তিনি ‘‘লাভ সার্কাস’’, ‘‘শোনো মন বলি তোমায়’’, ‘‘পতি পরমেশ্বর’’, ‘‘চতুষ্কোণ’’, ‘‘ব্যোমকেশ ফিরে এল’’ সহ বহু ছবিতে অভিনয় করে নিজস্ব জায়গা তৈরী করেন। ছোট পর্দার ছবিতে তাঁর আত্মপ্রকাশ ‘‘খেলা’’ ধারাবাহিকে। ওয়েব সিরিজে তিনি ছিলেন সমান সক্রিয়। মঞ্চ, সিনেমা, টেলিভিশন সব মাধ্যমেই সমান সাবলীল ছিলেন এই অভিনেতা। এছাড়াও দিনের শেষে তিনি ছিলেন একজন ভালো পাঠক, বিভিন্ন বিষয়ের বই সংগ্রহ ও পাঠের পাশাপাশি তাঁর লেখা পাঠক মহলে সমাদৃত ছিল। তাঁর অসাধারণ অভিনয়, প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি শিরদাঁড়াকে দৃঢ় রেখে স্পষ্ট মতামত দেওয়ার সহজাত প্রবৃত্তি চিরকাল অম্লান হয়ে থাকবে।

টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা এবং একইসঙ্গে ছবি, সিরিয়াল, ওয়েব সিরিজ, নাটক দাপিয়ে অভিনয় করা বাবিনের (রাহুলের) এমন অকাল মৃত্যু টালিগঞ্জের সিনেমা পাড়াতে তো বটেই, সাধারণ মানুষকেও স্তম্ভিত ও শোকে বিহ্বল করে তুলেছে। পাশাপাশি ‘টলিউড’-এর বুকে তৈরী হওয়া বিশৃঙ্খলা, তোলাবাজি ও সিন্ডিকেটের রাজত্বকে উন্মোচিত করেছে সবার সামনে, যেখানে শিল্পী থেকে কলাকুশলীদের নিরাপত্তা নিয়ে উঠে আসছে বহু প্রশ্ন। □

দেবাঞ্জন চক্রবর্তীর জীবনাবসান

এক দুঃসময়ের শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা দেবাঞ্জন চক্রবর্তী গত ২০ মার্চ, ২০২৬ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। বেশ কিছুদিন ধরেই বার্ধক্য জনিত কারণে ভুগছিলেন তিনি। তাঁর জীবনাবসানে সি আই টি ইউ সহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে শোক প্রকাশ করা হয়েছে। শোক প্রকাশ করেছেন বাংলা সহ দেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ।

দেবাঞ্জন চক্রবর্তী ১৯৫২ সালের ১৫ আগস্ট হুগলী জেলার ভদ্রকালীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন অধ্যাপক শহীদ সত্যেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী। মা ছিলেন উমা চক্রবর্তী। পিতা সত্যেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী বেলুড়ের শিল্প মন্দিরে অধ্যাপনা করতেন। তিনি অধ্যাপক সংগঠনের নেতাও ছিলেন। সত্তরের দশকে আধা ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের সময় ছাত্রদের ক্লাস নেওয়ার সময় কংগ্রেস ও নকশালপন্থীদের দ্বারা আক্রমণে তিনি নির্মমভাবে খুন হন। বাবা খুন হওয়ার পর বিভিন্ন পারিবারিক অসুবিধার মধ্যেও দেবাঞ্জন চক্রবর্তী বেলুড় শিল্প মন্দির, উত্তরপাড়া রাজা প্যারী মোহন কলেজ এবং কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে পড়াশোনা চালিয়ে যান। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান তিনটি বিভাগেই সাফল্যর সাথে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে পরিবারের হাল ধরতে তিনি প্রথমে বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন এবং পরে কেন্দ্রীয় সংস্থার অধীনে হিন্দুস্তান স্টিল কন্সট্রাকশন লিমিটেডে চাকরিতে যোগদান করেন এবং তখন থেকেই সক্রিয়ভাবে শ্রমিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন ও শ্রমিক কর্মচারীদের দাবিদাওয়ার লড়াই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অবসর নেওয়ার পর তিনি পূর্ণ সময়ের জন্য শ্রমিক আন্দোলন ও গণ আন্দোলনে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। ২০০৩ সালে সি আই টি ইউ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলনে তিনি অন্যতম সম্পাদক নির্বাচিত হন। নির্মাণকর্মীদের সারা ভারত ফেডারেশন তৈরী করার অন্যতম কারিগর ছিলেন তিনি। ১৯৭৯ সালে নির্মাণ কর্মীদের সারা ভারত প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক হন। ১৯৮৯ সালে কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া’র সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। নির্মাণ কর্মীদের বিশ্ব ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ২০১১ সালে। কমরেড চক্রবর্তী ছিলেন অত্যন্ত সহজ সরল মনের অধিকারী। সদাহাস্য ও সদালাপী মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর অতি সাধারণ জীবনধারা বিশেষভাবে উদাহরণযোগ্য। সাধারণ গরিব মেহনতি মানুষের সুখ দুঃখের আমৃত্যু সাথী ছিলেন তিনি। তাঁর অমায়িক ব্যবহার ভীষণভাবে আকৃষ্ট করত মানুষকে। এলাকায় দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের মধ্যে একজন উদাহরণযোগ্য বামপন্থী মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি। □

সুকান্ত চৌধুরী

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ঃ
“বাঁচলে বাংলার মান, বাঁচবে নারীর সম্মান”

ঊর্বা চৌধুরী

আজকের দিনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস আমাদের কাছে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রসঙ্গত, সূচনাকালে ক্লারা জেটকিনের নাম উল্লেখ করা যায় এখানে, তিনি যখন প্রথম প্রস্তাব করছেন ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস হিসেবে পালন করার জন্য, সে সময় প্রেক্ষাপট ছিল সম্পূর্ণতঃ ভিন্ন। যেহেতু নারী শ্রমজীবীরাই মূলত এই আন্দোলন প্রথম শুরু করেন এবং এগিয়ে নিয়ে যান সেই কারণে “শ্রমজীবী” শব্দটা আমাদের কাছে বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ, তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই এই শব্দের উল্লেখ করার প্রয়োজন। কিন্তু, পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট আন্দোলন বা শ্রমজীবী নারীদের আন্দোলনের যে পরিসর, সেই পরিসরের বাইরে গিয়ে সকল নারীর মুক্তির লড়াইয়ের প্রসঙ্গ যখন হয়ে ওঠে, তখন এটা একটা বৈশ্বিক চেহারা নেয় এবং সারা পৃথিবীব্যাপী একরকমের স্বীকৃতি তৈরী হয়। পরে রাষ্ট্রসংঘ সাতের দশকের মাঝামাঝি সময় মনে করে যে এটাকে কেবলমাত্র শ্রমজীবী নারীর পরিসরে আটকে না রেখে সকল নারীর মুক্তির, স্বাধীনতার তাৎপর্য বহন করতে পারে এরকম একটা দিন হিসেবে দেখা দরকার এবং পরবর্তীতে একে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

এই যে “শ্রমজীবী” শব্দটা রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্তে বাদ হলো এবং আমরাও একরকমভাবে খানিকটা খতিয়ে দেখে বিশ্লেষণ করে, বিচার বিশ্লেষণ করে ভাবলাম যে “শ্রমজীবী” শব্দটাকে বাদ দিয়ে “নারী দিবস” বললে সবটা বলা যাবে। কিন্তু অর্থনীতি যখন কাজের হিসাব করে, আসলে তখন সে শ্রমশক্তির হিসাব করে। কে আর্থিক ক্ষেত্রে সরাসরি কি কাজ করল, কত টাকার কাজ করল, সেটুকু হিসাব করে শেষ অবধি কাজের হিসাব হয় না। হিসাবটা হয়, একটি নির্দিষ্ট আর্থিক কাজের জন্য কতটা শ্রমশক্তিতে কোন কোন মানুষ কি কি ধরনের শ্রম ব্যয় করছেন, এবং তার ফলে কি উৎপাদন হচ্ছে। এই অঙ্কে শ্রমজীবী না কি, শ্রমজীবী নয়, কাজের প্রকৃতি এইসব চিন্তাগুলি আমাদের আলোচনায় উঠে আসে।

মজার কথা, বর্তমানে যে পরিসংখ্যান, তাতে দেখা যাচ্ছে ভারতে একজন উপার্জনশীল নারী আর্থিক কাজকর্মে যুক্ত থাকে দিনের বেশ কিছুক্ষণ, আর সার্বিকভাবে ঘরের কাজেও যুক্ত থাকেন—দিনের ন্যূনতম পাঁচ ঘণ্টা। পুরুষরা ঘরের কাজে যুক্ত থাকেন গড়ে ৯৮ মিনিট থেকে ১০০ মিনিট।

এই বৈষম্যটা কেন? কারণ আমাদের সমাজে কাজ লিঙ্গায়িত। পুরুষের কাজ এক প্রকার, নারীর কাজ আরেক প্রকার। আসলে কথা হলো ঘরের কাজ দিয়েও কিছু না কিছু উৎপাদিত হয়, যা আর্থিক উৎপাদনের সাথে জড়িয়ে কি উৎপাদিত হয় ঘরের কাজ মারফৎ? শ্রমশক্তি, অর্থাৎ কারখানায় খাটবে সে শ্রমশক্তি, তারই পুনরুৎপাদন করে “ঘরের কাজ”। এই ব্যাখ্যা ক্লারা জেটকিন, রোজা লুক্সেমবার্গ, আলেকজান্দ্রা কোলনতাই, কার্ল মার্ক্স, ফ্রেডরিক এঙ্গেলস থেকে শুরু করে কমরেড লেনিন সবাই দিয়েছেন।

মুশকিল হলো, দিনের পাঁচ ঘণ্টা ঘরের কাজের স্বীকৃতি উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত কাজ হিসেবে নেই। “আজকে মাছের ঝোলটা খেতে খুব ভালো হয়েছে” এই স্বীকৃতিটা আছে, মানে তার সামাজিক মূল্যায়ন হচ্ছে। কিন্তু সেই রান্না করার কাজ যে উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, সেই বোঝাপড়া দুর্বল বলে সেই কাজের আর্থিক মূল্যায়ন নাই। আর এই স্বীকৃতিটা না থাকার কারণে শ্রমটারই ন্যায্য স্বীকৃতি নাই আর তাই তাতে নারীর ব্যয়িত শ্রমশক্তিটার ন্যায্য স্বীকৃতি নেই। ব্যয়িত শ্রমশক্তিটার ন্যায্য স্বীকৃতি না থাকার কারণে যে নারী ঘরের বাইরে গিয়ে আর্থিক কাজে যুক্ত হতে পারছেন না তিনিও যে আসলে “শ্রমজীবী”-ই—সেই স্বীকৃতিটাও নাই। এই স্বীকৃতিটা নাই বলেই খুব দৃপ্ত কণ্ঠে, প্রকটভাবে আমাদের বলতে হয় এবং বলতে হবে, বলেই যেতে হবে; লাল সেলাম ৮ মার্চ, লাল সেলাম আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস।

স্বীকৃতি থাকলে ‘শ্রমজীবী নারী দিবস’ না বলে কেবল নারী দিবস বলা যেত। স্বীকৃতি নেই বলে বারবার ব্র্যাকেটে আমরা শ্রমজীবী শব্দটা উল্লেখ করে আমরা ঘরের কাজের সঙ্গে উৎপাদন কাঠামোর কি সম্পর্ক আছে তা মনে করিয়ে দিতে চাই।

বাংলার মান বাঁচাবার প্রসঙ্গ যখন উঠছে, আসলে কীসের প্রসঙ্গ উঠছে? বাংলায় যে নাগরিকরা রয়েছেন তাদের মান বাঁচানোর প্রসঙ্গ উঠছে। নাগরিক মানে কি? নাগরিক মানে মানুষ এবং একটা মানুষ ভালো আছে না খারাপ আছে, তার মান রক্ষিত হলো না হলো না, সেই সবটাই নির্ভর করে সেই মানুষটা কেমনভাবে বেঁচে আছে এটা বিচারের উপর।

এবারে বেঁচে থাকার আমরা খুঁটিনাটি হিসেব নিকেশ করে দেখতে চাই। তার কারণটা হলো, বামপন্থী সংগঠন পুঁজির, পুঁজিবাদের অঙ্ক, এই মুহূর্তে যেটা চলছে, সবটার ক্ষেত্রেই অঙ্ক হিসাববিজ্ঞান শব্দেরই আমাদের বিশ্লেষণ করে বাস্তবের কথা বলতে হয়, সেটাই আমাদের ধারা। ফলে একটা মানুষ কেমনভাবে বেঁচে আছে এটা বোঝার জন্য অঙ্ক বাদ দিয়ে আমরা ভাবতে পারি না। সার্বিকভাবে কেমনভাবে বেঁচে আছে বোঝার জন্য যেটা লাগে সেটা হলো মানব উন্নয়নের বিভিন্ন রকমের সূচক। একটা মানুষের উন্নয়ন কীভাবে হচ্ছে এবং সেই সংক্রান্ত তার সক্ষমতা, তার স্বনির্ভরতা কীভাবে গড়ে উঠছে।

মানব উন্নয়নের সূচকগুলো কি কি? সাধারণভাবে চর্চার মধ্যে থাকে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকা বা পেশা, আয়। এর সঙ্গে আরো আরো কিছু যুক্ত হয়েছে। যত বেশি লিঙ্গ বৈষম্য বেড়েছে আমাদের সমাজে, তত বেশি লিঙ্গগত সাম্যের প্রসঙ্গটা বারবার করে উঠে এসেছে।

এবার একটা ভূখণ্ডকে বোঝার জন্য, এই মুহূর্তে বাংলা যেহেতু আজকের চর্চার বিষয়, সেখানকার যে মানুষগুলো যেমন আছে স্বাভাবিকভাবেই বাংলার মান বাঁচা এবং তার মানুষের মান বাঁচা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে।

শিক্ষা স্বাস্থ্য জীবিকা, এই প্রসঙ্গে যখন আমরা কথা বলছি, তখন ভারতের প্রসঙ্গটা আনতে হবে শুধু বাংলাকে আলাদা করে কথা বলে জিনিসটা খুব সার্বিকভাবে কথা বলা যাবে না। তার কারণ পশ্চিমবঙ্গে এবং ভারতের যে সমাজের গঠন, তার মধ্যে যে সামন্তবাদী অভ্যাসগুলি রয়েছে, যেটা পরিবারের মাধ্যমে এবং পরিবারের বাইরের যে পরিবেশ তার মাধ্যমে প্রযুক্ত হয়, অভ্যাস করা হয়, চর্চা করা হয়, সেটা ভীষণ ভাবে এক। কোনো রাজ্যে একটু বেশি লিঙ্গ বৈষম্যের প্রবণতা আছে, কোনো রাজ্যে একটু কম, কোনো রাজ্যে প্রকটভাবে লিঙ্গ বৈষম্য অভ্যাস করার রেওয়াজ আছে, কোনো রাজ্যে খুব চতুরভাবে প্রয়োগ করার চাতুরি আছে। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের একটি খুব পরিশীলিত ভালো দিক, এখানে লিঙ্গ বৈষম্য চর্চা করা হয়। ফলে সেইগুলির ধারাপাত রয়েছে। কিন্তু মোটামুটি গোটা ভারতে সমাজটার গঠন এক।

গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স-এর এখানে সূত্রপাত হয়েছে। আসলে গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স ‘ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম’-এর সমীক্ষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন দেশকে নিয়ে মানে ১৪০-১৫০টা দেশকে নিয়ে করা হয়, কিন্তু সব কটা দেশ যোগদান করে না সমীক্ষাটায়। মোটের ওপর ১৪০-৫০-এর মধ্যে দেশ অংশগ্রহণ করে। সাম্প্রতিক যে তথ্য আমাদের কাছে রয়েছে ২০২৫-এর, তাতে ১৪৮ খানা দেশ এই সমীক্ষাটায় অংশগ্রহণ করেছে। অংশগ্রহণের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে যে আসলে এখানে লিঙ্গ বৈষম্যটা ঠিক কোন জায়গায় রয়েছে। নারী কোন অবস্থানে, পুরুষ কোন অবস্থানে আলাদা আলাদা করে এটা নয়। নারী এবং পুরুষের তুলনামূলক অবস্থানের একটা হিসেব। যা দিয়ে জেন্ডার গ্যাপ বা লিঙ্গ বৈষম্যটা বোঝা যায়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৪৮টা দেশের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ভারতের অবস্থান লিঙ্গ বৈষম্যের প্রশ্নে ১১০তম। অত্যন্ত খারাপ। মানে আমরা এগোচ্ছি, আমাদের সমাজ এগোচ্ছে, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও মেয়েদের রক্ষা করো তার জন্য এতগুলি প্রকল্প, এত কাঠখড় পুড়িয়েও শিক্ষার ক্ষেত্রে যে জেন্ডার গ্যাপটা পাওয়া যাচ্ছে সেই জেন্ডার গ্যাপের অবস্থান হচ্ছে ১১০তম।

আর্থিক অংশগ্রহণ যে কাজে যুক্ত হচ্ছে, বাড়ির বাইরে গিয়ে নানান রকম আর্থিক কাজে যুক্ত হচ্ছে, তাতে জেন্ডার গ্যাপ যেটা দেখা যাচ্ছে সেই জেন্ডার গ্যাপ হচ্ছে ১৪৪তম। শুধু স্বাস্থ্য এবং বেঁচে থাকা (সারভাইভাল), এতে যদি লিঙ্গ বৈষম্যের কথা দেখা যায় তাহলে দেখা যাচ্ছে ১৪৮তম দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান ১৪৩তম।

যদি রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রশ্নে আলোচনা করি, তাতে ভারতের অবস্থান ভালো, গ্যাপটা কম, ৬৯তম। এখানে আইনসভায় অংশগ্রহণে জেন্ডার গ্যাপ কেমন? সেইটা দেখতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে ভারতের অবস্থান ১২৪তম। ধপ করে পিছিয়ে পড়েছে। আর মন্ত্রী সভায় স্থান পাওয়ার ক্ষেত্রে যে জেন্ডার গ্যাপ নারী এবং পুরুষের মধ্যে, সেটা আবার আরো দুর্দশাগ্রস্ত, ১৪৮টা দেশের মধ্যে সেটার অবস্থান আমাদের দেশে হচ্ছে ১৩৮তম।

রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলার প্রসঙ্গ লক্ষণীয়। পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে যে সরকারটা চলছে, রাজ্যের শাসকদল, সেই শাসকদলে মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা এবং দেখা যাচ্ছে এই শাসকদলে মেয়েদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য রকমের বেশি। যা প্রায় পঞ্চাশ শতাংশের কাছাকাছি। কিন্তু যেটা নিয়ে চর্চা করা খুব জরুরি সেটা হচ্ছে যে ‘দ্য কোয়ালিটি অফ পার্টিসিপেশন’। এই যোগদানের গুণগত মানটা কি? বাংলা নিয়ে কথা বলতে গেলে এই প্রসঙ্গটায় গুরুত্ব দিতে হবে।

যখন আমরা গুণগত মান নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি তখন দেখছি এই বাংলা থেকে শাসকদল যে একটু প্রশংসিত হয়, চর্চার পরত খুলে যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তখন দেখা যাবে যাঁরা অংশগ্রহণ করেন, তাঁরাই আসলে কাঠপুতুলের মতো। ফলে এই রাজনৈতিক অংশগ্রহণ কীভাবে হচ্ছে মেয়েদের, সেটা আসলে পশ্চাৎগামী নাকি সেটা প্রগতিশীল সেটা আমাদের বুঝে নিতে হবে।

কেন্দ্রের শাসক দলের ভাবনাটা কী? একজন চিফ জাস্টিস ছিলেন। যখন কৃষক আন্দোলন চলছে সিঙ্ঘু বর্ডারে, তখন তিনি একদিন বিচার সভায় বসে বললেন যে মহিলাদের কেন রাখা হয়েছে এই আন্দোলনে সিঙ্ঘু বর্ডারে? ‘মহিলাদের রাখা হয়েছে’, মহিলাদের রাখার মানে কি? উত্তর ভারতের পাঞ্জাব হরিয়ানার মতো জায়গায় মহিলারা নিজেরাই কৃষক। মহিলাদের রাখতে হয় না। কিন্তু একজন বিচারপতি হিসাবে অবলীলায় বলে দিতে পারেন এই কথা।

নাবালিকা বিবাহের প্রসঙ্গ আমি বলার আগে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গে নাবালিকা বিবাহ; এই মুহূর্তে যে সর্বশেষ পরিসংখ্যানটা আমাদের কাছে আছে, ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে পাঁচ নম্বর রাউন্ডের তথ্য, সেটাতে বলছে, ২০-২৪ বছর বয়সী যতজন নারীর সঙ্গে কথা বলা হয় তাদের মধ্যে ৪১.৬ শতাংশ বিবাহ করেন নাবালিকা অবস্থায়। ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি। কন্যাশ্রীর প্রসঙ্গ এসেছে। কন্যাশ্রীর মতো একটা প্রকল্প ভাবা হয়েছিল—যদি করা যায় তাহলে অন্তত স্কুল শিক্ষা সমাপ্ত করতে সমর্থ হবে মেয়েরা।

যুক্তিটা ভুল ছিল না, দু’হাজার পাঁচ ছয় সালে এই নাবালিকা বিবাহের পরিসংখ্যান ছিল ৫৪ শতাংশ। ঠিক সেখান থেকে নেমে ২০১৫-১৬ সালে ১০ বছরে সেটা ১৩ শতাংশ বিন্দু মতো কমে গেছে। ৪১.৬ শতাংশে এসেছে। কিন্তু ২০১৫-১৬ সালের পর থেকে আর কমছে না। কন্যাশ্রীর মতো ইনসেনটিভ যদি চালু থাকে কমার কথা ছিল। কিন্তু কেন কমলো না? যখন মাত্র ১০টা বছরে পশ্চিমবঙ্গের মতো একটা রাজ্যে ৭ হাজারটা স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। স্কুল বাড়িটায় তালা পড়ে যায়, যখন কন্যাশ্রী দেওয়ার যে উৎস অর্থাৎ স্কুলবাড়িটাই আসলে বন্ধ হয়ে যায়, তখন স্বাভাবিকভাবেই এই ভাতাটির কার্যকারিতা থাকছে না। স্কুলগুলো যদি ন্যায্যভাবে চালু থাকত তাহলে আজকে মেয়েদের এই অবস্থা হত না।

নাবালিকা বিবাহ আটকানোর ক্ষেত্রে স্কুল যে ভূমিকা নিতে পারে, পৃথিবীর কোনো প্রতিষ্ঠান এমনকি পরিবারও সেই ভূমিকা নিতে পারে না। সেই স্কুল বাড়িগুলো দিয়েছে বন্ধ করে। এই স্কুল বন্ধ করার ক্ষেত্রে এই মুহূর্তের যে দুই শাসক আছে—একটি কেন্দ্রের, আর অপরটি রাজ্যের দুইয়েরই ভূমিকা একেবারে বেপরোয়া, লাগামছাড়া।

শুধুমাত্র দক্ষিণ ২৪ পরগণার ব্লকগুলোতে ১১৯২টি স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। একটা তথ্য, গোটা ভারতে ৮ হাজার মতো স্কুলে কোনো ছাত্র নেই কিন্তু শিক্ষক আছে। তার মধ্যে ৩৮১২ খানা ছাত্রশূন্য স্কুল শুধু পশ্চিমবঙ্গেই রয়েছে। গোটা ভারতে দেখা যাচ্ছে এই ৮০০০ মতো ফাঁকা স্কুলে ২০ হাজার শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। আর সেই ২০ হাজারের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ছাত্রশূন্য স্কুলে নিযুক্ত শিক্ষকের সংখ্যা ১৭,৯৬৫ জন।

আমরা আসলে খুব একটা ধরতেও পারি না যেহেতু বিশেষ করে মধ্যবিত্ত সমাজে সরকারী স্কুলে ভর্তি করার প্রবণতা কমে গেছে—প্রায় শূন্য হয়ে গেছে, আমরা ঠিক জানিও না আমাদের এই সরাসরি স্কুলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ না থাকার কারণে কি হয়ে চলেছে পশ্চিমবঙ্গে; আমরা যতটা বলছি সেটা হিমশৈলের চূড়ামাত্র আর কিচ্ছু না। আমরা যতটা পথসভায় বলছি হলসভায় বলছি, নিজেদের মধ্যে চা খেতে খেতে বলছি কিছু বলছিই না। কি কেলেঙ্কারি করে বসে রয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থায় এবং তার প্রত্যেকটার পরিণাম হচ্ছে এই নাবালিকা বিবাহ বলুন, নিখোঁজ হয়ে যাওয়া মেয়ে বলুন—নানা কিছু। পশ্চিমবঙ্গ নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ছেলে মেয়ের মধ্যে সব থেকে উপরের দিকে রয়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক অপ্রাপ্তবয়স্ক মিলিয়ে প্রায় ৮২ হাজার নারী নিখোঁজ হয়েছে সাম্প্রতিক ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর তথ্য।

কাশীপুর বলে একটা গ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর এক ব্লকে। ওখানে আমরা একটা সমীক্ষার কাজে গিয়েছিলাম। কাশীপুর গ্রামটাতে গিয়ে আমরা একজন এ.এন.এম.-কে ইন্টারভিউ করেছি, করে জিজ্ঞেস করেছি যে কী অবস্থা আপনাদের এখানে? রক্তাল্পতার অবস্থা, বাড়িতে বাচ্চার ডেলিভারি ইত্যাদি এইসব হিসেব তাদের কাছে থাকে, সেইসব নিয়ে প্রশ্নটশ্ন করেছি। কথা প্রসঙ্গে উনি বললেন আমাদের এখানকার এই মুহূর্তের সমস্যা হচ্ছে আর্লি ম্যারেজ এবং আর্লি মাদারহুড। কোভিডের ঠিক পরেই গিয়েছিলাম। কোভিডের এই দুটো বছরের মধ্যে কত কিশোর

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

কেন্দ্রীয় সরকারের মার্কিনমুখী বিদেশ নীতি

বিদ্যুত দাস

কোনও সরকার বা দেশের বৈদেশিক নীতি হলো সেই দেশের আভ্যন্তরীণ নীতির প্রতিফলন। ভারতের স্বাধীনতা-পরবর্তী বিদেশ নীতি ঐতিহাসিকভাবে কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন, উপনিবেশ বিরোধিতা এবং তৃতীয় বিশ্বের ঐক্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে ভারত Non-Aligned Movement-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নিজেদের অবস্থান নির্ধারণ করেছিল। এই নীতি ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠিত। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিশ্ব রাজনীতিতে একমেরুকরণ শুরু হয়, যার ফলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৯০-এর দশক থেকেই ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হতে থাকে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক উদারীকরণের পর। তবে নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ে এই নীতিতে একটি স্পষ্ট মার্কিনমুখী পুনর্গঠন লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে ভারতের ক্রমবর্ধমান সংযুক্তি, যা শুধু কূটনৈতিক নয়—অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রেও গভীর প্রভাব ফেলছে।

মোদী সরকারের সময়ে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যা ভারতের কৌশলগত স্বাধীনতাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়।

(ক) LEMOA (Logistics Exchange Memorandum of Agreement, 2016)

এই চুক্তির মাধ্যমে দুই দেশের সেনাবাহিনী একে অপরের সামরিক ঘাঁটি ব্যবহার করতে পারে। এটি ভারতের ভূখণ্ডকে মার্কিন সামরিক কৌশলের অংশে পরিণত করার পথ খুলে দেয়।

(খ) COMCASA (Communications compatibility and security Agreement, 2018)

এই চুক্তির মাধ্যমে ভারত উন্নত মার্কিন সামরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহার করতে পারে। এর ফলে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মার্কিন প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

(গ) ISA (Industrial Security Annex, 2019) চুক্তিটি GSOMIA (General Security of Military Information Agreement)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন (Annex), যা দুই দেশের বেসরকারী প্রতিরক্ষা শিল্পের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের পথ খুলে দেয়। GSOMIA চুক্তিটি ভারত ও আমেরিকার মধ্যে ২০০২ সালে স্বাক্ষরিত হয়।

(ঘ) BECA (Basic Exchange and Cooperation Agreement, 2020)

এই চুক্তির ফলে ভারত মার্কিন উপগ্রহ তথ্য ব্যবহার করতে পারে, যা সামরিক অভিযানে সহায়ক। তবে এতে ভারতের তথ্য নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

এই চারটি চুক্তি মিলিয়ে ভারত কার্যত মার্কিন সামরিক কাঠামোর সঙ্গে একীভূত হয়ে পড়ছে।

QUAD ও ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল — ভারত Quadrilateral Security Dialogue (QUAD)-এর সদস্য হিসেবে জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি কৌশলগত জোটে অংশগ্রহণ করছে। এই জোটের প্রধান লক্ষ্য চীনের উত্থানকে প্রতিহত করা। এই জোটকে এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে দেখা হয়। QUAD ভারতের পররাষ্ট্রনীতিকে স্বাধীনতা থেকে সরিয়ে এনে এক সংঘাতমুখী অবস্থানে ঠেলে দিচ্ছে।

অর্থনৈতিক নির্ভরতা ও কর্পোরেট স্বার্থ—মোদী সরকারের 'মেক ইন ইন্ডিয়া', 'স্টার্টআপ ইন্ডিয়া' ইত্যাদি কর্মসূচীর মাধ্যমে বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এর ফলে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। Amazon, Walmart, Google প্রভৃতি মার্কিন কোম্পানির ভারতীয় বাজারে ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। এর ফলে দেশীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং অর্থনীতি ক্রমশ বৈদেশিক পুঁজির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে।

চীনবিরোধী অবস্থান ও ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা—মোদী সরকারের সময়ে ভারত-চীন সম্পর্ক ক্রমশ অবনতির দিকে গেছে, বিশেষ করে লাদাখ অঞ্চলে সংঘর্ষের পর। এই প্রেক্ষাপটে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। এই চীনবিরোধী অবস্থান আসলে মার্কিন কৌশলের অংশ, যা এশিয়ায় সংঘাত সৃষ্টি করে অস্ত্র ব্যবসা ও সামরিক আধিপত্য বাড়াতে চায়।

পশ্চিম এশিয়া নীতিতে মার্কিন প্রভাব—ভারত ঐতিহ্যগতভাবে পশ্চিম এশিয়ায় একটি ভারসাম্যপূর্ণ নীতি অনুসরণ করত—একদিকে ইরান, অন্যদিকে ইসরায়েল। কিন্তু মোদীর আমলে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

প্যালেস্তাইন প্রশ্নে ভারতের অবস্থান নীরব সমর্থন। ঐতিহাসিকভাবে ভারত প্যালেস্তাইন-এর জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। PLO-কে স্বীকৃতি দেওয়া এবং জাতিসংঘে প্যালেস্তাইনের পক্ষে ভোট দেওয়া ছিল ভারতের দীর্ঘদিনের অবস্থান। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, বিশেষত ইসরায়েল-এর সঙ্গে প্রতিরক্ষা ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বৃদ্ধির ফলে ভারতের অবস্থান অনেকটাই বদলেছে। বেনজামিন নেতানিয়াহু ও মোদীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এই পরিবর্তনের প্রতীক। গাজা উপত্যকায় বারবার সামরিক আক্রমণ, অসামরিক মানুষের মৃত্যু এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় ভারত কার্যত নীরব থেকেছে, যা আসলে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল জোটের প্রতি সমর্থন। ভেনেজুয়েলা প্রসঙ্গঃ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে নীরবতা—লাতিন আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলা দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন হস্তক্ষেপের শিকার। নিকোলাস মাদুরো-র সরকারকে অস্থিতিশীল করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র নানা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ও রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেছে। সম্প্রতি আমেরিকা মাদুরোকে 'অপহরণ' করার জন্য আন্তর্জাতিক মহলে বিতর্ক সৃষ্টি হলেও ভারত সরকার এ বিষয়ে কার্যত নীরব থেকেছে। এই নীরবতা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রতি নীরব সম্মতি। ঐতিহাসিকভাবে লাতিন আমেরিকার সঙ্গে ভারতের যে নৈতিক সংহতি ছিল, তা এখানে অনুপস্থিত।

রাশিয়া থেকে তেল আমদানি ও মার্কিন চাপ— রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর ভারত রাশিয়া থেকে সস্তায় তেল আমদানি বাড়ায়। এটি ভারতের অর্থনীতির জন্য লাভজনক হলেও যুক্তরাষ্ট্র এর বিরোধিতা করে। মার্কিন প্রশাসন ভারতের ওপর বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করে—নিষেধাজ্ঞার হুমকি, বাণিজ্যিক শুল্ক বাড়ানোর ইঙ্গিত এবং কূটনৈতিক চাপ।

যদিও ভারত প্রকাশ্যে এই চাপ অস্বীকার করেছে, বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে মার্কিন নীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার প্রবণতা দেখা যায়। এটি ভারতের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বকে সীমিত করে এবং একটি নির্ভরশীল অর্থনীতির দিকে ঠেলে দেয়।

গত ২৭ জানুয়ারি, ২০২৬ ভারত ও ইইউ-র মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করে মোদী বলেছিলেন ভারতের ১৪০ কোটি মানুষ এবং ইউরোপের দেশগুলির কয়েক কোটি মানুষের জন্য দারুণ সুযোগ তৈরী করবে । এটা নির্মাণ শিল্প এবং অনুসারী শিল্পগুলির ক্ষেত্রে আরও গতি আনবে। এর ফলে বাণিজ্যের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক গণতন্ত্রও পোক্ত হবে বলেও জানিয়েছিলেন মোদী। ওই বাণিজ্য চুক্তিকে মাদার অব অল ড্রিলস (সব চুক্তির জননী) বলে চিহ্নিত করে মোদী বলেছিলেন, ''কিন্তু এখানে আমাদের থামলে চলবে না, বিকশিত ভারতের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এগিয়ে যেতে হবে।'' ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে শুল্ক কমানো, বাজার উন্মুক্ত করা এবং বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ানোর লক্ষ্য রয়েছে। এই ধরনের চুক্তি ভারতের কৃষি ব্যবস্থার জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। কারণ—ইউরোপীয় ভর্তুকিপ্রাপ্ত কৃষিপণ্য ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করবে, দেশীয় কৃষকরা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বে এবং খাদ্য নিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এটি ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদী সংকট সৃষ্টি করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়।

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

কৃষি যখন সঙ্কটে

সুদীপ সামন্ত

● ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরো এবং WTO-র রিপোর্ট অনুসারে গত ৩০ বছরে ৪ লক্ষাধিক কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। প্রতিদিন গড়ে ৩১ জন কৃষক ও ৮৬ জন খেতমজুর।

● যে পাঞ্জাবে সবুজ বিপ্লব হয়েছিল, সেই পাঞ্জাবেও কৃষক আত্মহত্যা ক্রমবর্ধমান। পাঞ্জাবের চারটি বিশ্ববিদ্যালয় যৌথ গবেষণা করে দেখিয়েছে ৬৮ শতাংশ কৃষক ঋণগ্রস্ত এবং গ্রাম ভারত আরও কৃষক আত্মহত্যার দিন গুনছে।

● টাইমস অফ ইন্ডিয়া প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হচ্ছে গত চার দশকে কৃষিতে কায়িক শ্রমশক্তির প্রয়োগ কমে দাঁড়িয়েছে ৫ শতাংশ এবং ভূমিহীন খেতমজুরের সংখ্যা বেড়েছে ৯৩ শতাংশ।

● ৫০-এর দশকে যেখানে জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান ছিল ৫৭ শতাংশ তা কমতে কমতে এখন ১৪ শতাংশেরও নীচে।

● স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে খাদ্য সঙ্কট মোকাবিলা করে স্বয়ম্ভরতার যে চিত্র ছিল তা আজ অনিশ্চয়তার মুখে—কৃষি সঙ্কটের এই আবহে খাদ্য নিরাপত্তাও আজ বিপন্ন।

কেন এই সঙ্কট?

● নয়া উদারবাদী নীতির মূল কথা হলো সরকারী ব্যয় বরাদ্দ কমানো এবং সেই নীতি অনুসরণ করে কৃষি ও কৃষককে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে বাজারের অসম প্রতিযোগিতার মুখে—বহুজাতিকদের সাথে প্রতিযোগিতায় হেরে কৃষকরা ক্রমশ নিঃস্ব ও ঋণগ্রস্ত হচ্ছেন।

● কৃষিখাতে ব্যয় বরাদ্দ কমতে কমতে এখন মাত্র ৩.১৫ শতাংশ।

● ১৯৭৭-এর নভেম্বর থেকে রাসায়নিক সারের দাম বিপণন সবই সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল—সারের সর্বোচ্চ মূল্য নির্দিষ্ট থাকতো। ২০১১-র জুলাই মাস থেকে সব কিছু বিনিয়ন্ত্রণ করে দেয় একমাত্র ইউরিয়া ছাড়া।

● ইউরিয়া সারে সাবসিডি কমেছে বিগত বছরের তুলনায় ৩৪.৭ শতাংশ।

● পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির সাথে সাথে রাসায়নিক সার, কীটনাশক, বিদ্যুৎ ও সেচের জলের খরচ, হিমঘর, পরিবহন সহ চাষের সমস্ত উপকরণের দাম বেড়েছে অস্বাভাবিক হারে।

● বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে আবহাওয়া চরম ভাবাপন্ন হওয়ায় খরা, বন্যা, ঝড়, অতি বৃষ্টি, শীলা বৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে বছরে গড়ে ২৭১ দিন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শস্যহানি ঘটছে। মাথায় রাখতে হবে ভারতের ৫৬ শতাংশ জমি বৃষ্টিনির্ভর আবার সেচ নির্ভর জমির ৬১ শতাংশ গ্রাউন্ড ওয়াটার, ৭৬০০ কিমি কোস্টাল এরিয়া।

কৃষি সঙ্কট ও কেন্দ্রের সরকারের ভূমিকা

● ৯০-এর দশক থেকে কৃষিতে যে সঙ্কট তৈরী হয়েছে তার মোকাবিলায় বামপন্থীদের সমর্থনে তৈরী হওয়া ইউ পি এ-১ সরকার ড. এম এস স্বামীনাথনের নেতৃত্বে জাতীয় কৃষি কমিশন গঠন করে। এই কমিটি চারটি সুপারিশ করে, যার মধ্যে অন্যতম হলো MSP (ন্যূনতম সহায়ক মূল্য)—খরচের ওপর ৫০ শতাংশ লাভ সহ ভূমি সংস্কার, সেচের সুবিধা বৃদ্ধি, শস্য বীমা, সুলভ ঋণের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

● বামপন্থীদের সমর্থনে ইউ পি এ-১ সরকার মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ কর্মসংস্থান আইন ((MGNREGA), খাদ্য নিরাপত্তা আইন সহ কৃষক ও খেতমজুরের স্বার্থে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আইন প্রণয়ন করে।

● স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার দাবিতে দেশের নানা প্রান্তে আন্দোলন শুরু হয়। লকডাউনের সুযোগে কৃষক স্বার্থবিরোধী তিনটি বিল সরকার পাশ করায়। তার বিরুদ্ধে দেশজোড়া ঐক্যবদ্ধ কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়। ৭৩৬ জন কৃষক শহীদ হন, সরকার পিছু হঠতে বাধ্য হয়ে বিল স্থগিত করে। কৃষক আন্দোলনের চাপে দাবিগুলি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।

● প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি বরং সরকার সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে জানায় স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ মানা সম্ভব নয় বলে। স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক MSP-র পরিবর্তে সরকার নির্ধারিত উৎপাদন মূল্যের সাথে পারিবারিক শ্রম (A_2+FL) যুক্ত করে MSP নির্ধারণ করা হয়, যা প্রকৃত উৎপাদন ব্যয়ের থেকেও কম। সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল ১৪টি মূল ফসলের, কিন্তু ৩/৪টির জন্য ক্রয় কেন্দ্র খোলা হয়। বস্তুতপক্ষে ১০-২০ শতাংশ ফসল কেনে, ফলে কৃষককে অভাবী বিক্রি করতে হয়।

● কেন্দ্রের সরকার কর্পোরেটদের কোটি কোটি টাকা কর ছাড় দেয় (বর্তমান বছরে ১৪.৫ শতাংশ), ব্যাঙ্ক ঋণ মঞ্জুর হয়—তার বেশির ভাগটাই অনাদায়ী থেকে যায়—অপরদিকে যে কৃষকরা আত্মসম্মান বোধ থেকে আত্মহত্যা করেন তাঁদের ঋণ শোধ না করার হার মাত্র ১ শতাংশ।

● কেন্দ্রের আর্থিক সমীক্ষায় উঠে এসেছে মাসে কৃষিজীবীদের গড় আয় মাত্র ১৬৬৬ টাকা—যা দিয়ে একটা পরিবার চালানো অসম্ভব।

● বীজ আইন প্রণয়ন এবং রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করে বীজের বাজার পুরোপুরি কর্পোরেটদের নিয়ন্ত্রণে। ফলে খাদ্যশস্যের বদলে বাণিজ্যিক ফসল চাষ, চুক্তিচাষের মাধ্যমে স্বনির্ভর কৃষককে কর্পোরেটের মুখাপেক্ষী করেছে শুধু নয়, কর্পোরেটের চুক্তিভঙ্গ, নির্দিষ্ট মাপের ক্রয়—ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষকের সর্বনাশ—কর্পোরেটের পৌষ মাস।

আমাদের রাজ্যে

● কৃষক আন্দোলনের আবহে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা হলে খাদ্যশস্য ও কৃষিপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়ন করে—(The West Bengal Markets Regulation Act. 1968)। পরবর্তীতে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হলে তা কৃষকের স্বার্থে আরও নিয়ন্ত্রিত করার জন্য ১৯৭৭, ৭৮, ৮১ সালে সংশোধন করা হয়—এতে কৃষক যেমন ফসলের উৎপাদিত ন্যায্য মূল্য পেতেন, তেমনই সাধারণ মানুষও ন্যায্য মূল্যে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করতে পারতেন।

● ৭৭ সালে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা হলে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে ১৩ লক্ষ একর জমি কৃষককে বিলি বণ্টন করা হয়। বর্গা রেকর্ড এবং বাস্তুভিটার ক্ষেত্রেও অধিকার স্বীকৃত হয়।

● সেচের সম্প্রসারণ হয় তিন গুণ। অনাবাদি জমি আবাদি হয়, এক ফসলা জমি দ্বিফসলী বা বহু ফসলী হয়।

● সরকারী কৃষি পরিকাঠামোকে

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে

নারী নির্যাতনের সাত কাহন

স্মরণে থাক—অশ্রুতে নয়, অগ্নিবাণে

দেড় দশকের বাংলা

পার্ক স্ট্রীট ঃ ২০১২ সালে পার্কস্ট্রীটে গণধর্ষণের শিকার হলেন সুজেট জর্ডান, আক্রান্ত জর্ডানের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন রাজ্যের শাসকের। *তথ্যসূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা*

কামদুনি ঃ ২০১৩ সালে কামদুনি গ্রামে কলেজ ফেরত ছাত্রীকে গণধর্ষণ, পা ছিঁড়ে হত্যা, প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে অপরাধীদের আড়ালের চেষ্টা। *তথ্যসূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা*

মধ্যমগ্রাম ঃ ২০১৩ সালের ২৫ অক্টোবর নাবালিকা গণধর্ষণের শিকার হয়, পুলিশে অভিযোগ দায়ের করার পরে ২৭ অক্টোবর পুনরায় অভিযুক্তদের দ্বারা গণধর্ষণের শিকার হয় কিশোরী মেয়েটি। পরবর্তীতে এয়ারপোর্টের বাড়িতে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় মৃত ঘোষিত হয়। রাজ্য প্রশাসন অপরাধীদের আড়ালের চেষ্টা করে।

তথ্যসূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা

হাঁসখালি ঃ ২০২২ সালে ভয়াবহ নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার হয় এক কিশোরী। মৃত্যুর পরে নির্যাতিতার বাবার সামনে থেকে মৃতদেহ লোপাট করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ ব্যক্তি বলেন—"মেয়েটার শুনেছি এ্যাফেয়ার ছিল, একে কি ধর্ষণ বলবেন?" *তথ্যসূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা*

আর জি কর ঃ ২০২৪ সালে আর জি কর হাসপাতালে কর্মরত মহিলা ডাক্তারের ধর্ষণ ও খুন চমকিত করে সমগ্র বিশ্বকে। প্রাথমিকভাবে এই ধর্ষণ ও হত্যাকে আত্মহত্যা হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করে রাজ্য প্রশাসন। পরবর্তীতে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের চাপে একজন সিভিক ভলিন্টিয়ারকে সাজিয়ে গুছিয়ে দোষী সাবস্ত করার চেষ্টা হয়। কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সি সি বি আইকে এই হত্যার তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হলেও বিচার অধরা। দায় এড়িয়ে যেতে পারছে না রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার।

২০১৬ সালে নারী নির্যাতনে দ্বিতীয় পশ্চিমবঙ্গ, নারী নির্যাতনের মামলা ১৯৯৫২টি।

তথ্যসূত্র ঃ NCRB report 2021

ডবল ইঞ্জিন সরকারের কাহিনী

কাঠুয়া ঃ ২০১৮ সালে জম্মু কাশ্মীরের কাঠুয়ায় ৮ বছরের শিশু সন্তানকে মন্দিরের ভিতরে গণধর্ষণ ও হত্যা। প্রমাণ লোপাটের চেষ্টার কারণে দুই পুলিশ অফিসার অভিযুক্ত, গেরুয়া শিবির অভিযুক্তদের পক্ষে মিছিল করে মুক্তির দাবি তোলে।

উন্নাও ঃ ২০১৭ সালে উত্তরপ্রদেশের উন্নাও-এ শাসকদলের বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গার। এক বছর ধরে রাজ্য পুলিশ এই অভিযোগের ভিত্তিতে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ২০১৮ সালে আক্রান্তের পরিবার আত্মহত্যা করতে গেলে সকলের নজরে আসে। প্রমাণ লোপাটের চেষ্টায় আক্রান্তের আইনজীবী ও আত্মীয়াকে হত্যা করা হয়। আক্রান্ত কিশোরী অল্পের জন্য বেঁচে যায়। ২০২৫ সালে হাইকোর্টে রাজ্য সি বি আই-এর দুর্বল পদক্ষেপের কারণে জামিন পায় অভিযুক্ত। বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে বিষয়টি বিচারাধীন।

হাথরাস ঃ ২০২০ সালে উত্তর প্রদেশের হাথরাসে দলিত মেয়েকে গণধর্ষণ ও হত্যা করে তথাকথিত উচ্চবর্ণের পুরুষরা। অভিযোগের পর ১০ দিন পর্যন্ত কোনও গ্রেপ্তার হয়নি। প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা হয় ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে, রাতারাতি নির্যাতিতার দেহ সৎকার করে পুলিশ প্রশাসন।

গুজরাট ঃ ২০০২ সালে গুজরাট দাঙ্গার সময় অন্তসত্বা মহিলা বিলকিস বানু গণধর্ষণের শিকার হন। রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকার মধ্য দিয়ে ২০২২ সালে অভিযুক্তরা ছাড়া পায়। হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি মালা পরিয়ে অভিযুক্তদের সংবর্ধিত করে। তবে ২০২৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট ওই রায়ের বিরুদ্ধে আবার বিচার শুরু করে ও অভিযুক্তদের জেল হেফাজতে নিতে বলে।

গডম্যান কাণ্ড ঃ নাসিকের স্বঘোষিত ধর্মগুরুর বিরুদ্ধে একাধিক মহিলাকে ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। এই "গডম্যান" কাণ্ডে মহারাষ্ট্রের মহিলা কমিশনের প্রধানের সঙ্গে অভিযুক্তের ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ উঠছে।

২০২১ সালে নারী নির্যাতনে শীর্ষে উত্তর প্রদেশ, দ্বিতীয় মধ্যপ্রদেশ। নারী নির্যাতনের মামলার ১৫% ঘটনা ঘটে উত্তরপ্রদেশে (৪৮, ৭৫৭টি)

তথ্যসূত্র ঃ NCRB report 2021

পিকু ব্রহ্ম, কণিকা টুডু

শৃঙ্খল ভাঙার সময় এসেছে কি আজ তবে?
অন্যায়ের ওই পাষাণ প্রাচীর কবে ধূলিসাৎ হবে?
জাগুক বিবেক ঘরের কোণে,
জাগুক রাজপথে,
ধ্বংস হোক ঘাতক-ছায়া
নারীর চলার পথে।

চোখের জল কেবল গাল ভেজায়, কিন্তু বুকের আগুন পথ দেখায়। কাঠুয়া, উন্নাও, হাথরাস, পার্ক স্ট্রীট, কামদুনি, মধ্যমগ্রাম, হাঁসখালি, অভয়া, মাটিয়া, তামান্না...। এই নামগুলি কেবল ভৌগোলিক স্থান, নাম বা ব্যক্তি পরিচয় নয়—এগুলি আমাদের সম্মিলিত সামাজিক বিবেকের গায়ে এক একটি ক্ষতচিহ্ন। চরম পাশবিকতা, ক্ষমতার দম্ভ এবং বিচারহীনতার এক একটি দলিল। কাঠুয়ার পাহাড়ের ঢাল ও হাথরাসের নির্জন খেত থেকে উন্নাওয়ের পিচ ঢালা রাজপথ, কামদুনির পরিত্যক্ত কারখানা, রাণাঘাটের কনভেন্ট স্কুল বা আর জি করের করিডোর—সর্বত্র ছড়িয়ে আছে নারীদের আর্তনাদ।

যথেষ্ট হয়েছে নোনা জলের বিসর্জন। আর না। সরকার এবং প্রশাসন যখন ক্ষমতার চাদরে ঢাকে অপরাধীকে এবং অপরাধের প্রমাণ লোপাট করে ভুক্তভোগীকেই দোষারোপ করতে তৎপর হয়, প্রতিটি কলম হোক তরোয়াল, প্রতিটি কণ্ঠ হানুক অগ্নিবাণ।

পার্ক স্ট্রীটের সুজেট জর্ডান, কাঠুয়ার আসিফা বানু, হাথরাসের মনীষা বাল্মিকী, কামদুনির শিপ্রা ঘোষ, রাণাঘাটের সিস্টার মীনা বারোয়া, আর জি করের অভয়া, কালীগঞ্জের তামান্না খাতুন... একের পর একজন বিচারের দাবি রেখে গেছে আমাদের ন্যায়বোধের কাছে। প্রতিকারকামী আন্দোলনের জোয়ারে স্ফুরিত হয়েছে গ্রাম শহরের রাজপথ। তবু ক্ষমতাসীনরা টলেনি। নারীর অমর্যাদার, নারীর অস্তিত্বের ওপর হামলার ঘটনায় অত্যাচারের বর্ণমালা লেখা হয়েছে ডায়েরির পাতায়। আজ তারা একজোট হয়ে সম্মিলিত শুভবুদ্ধির দরজায় কড়া নাড়ছে। তারা চাইছে আমাদের বাম হাতের তর্জনীতে এক এক ফোঁটা নীল কালিতে লেখা হোক বিচারহীনতার সংস্কৃতির মৃত্যুপরোয়ানা। ক্ষমতা আর পেশীশক্তিতে নারীকে যারা ভোগ্যপণ্য করে তোলে, যারা নারী নির্যাতনকারীদের মাথায় ছাতা ধরে থাকে, যারা নারীর বিরুদ্ধে অপরাধকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার হাতিয়ারে পরিণত করে—আমাদের দেশ, আমাদের রাজ্যের মানচিত্র থেকে তাদের নির্বাসনের ঐতিহাসিক গণ হুকুমত জারি হোক প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে ইভিএমের বোতামে আমাদের আঙুলের স্পর্শে। □

শাশ্বতী মজুমদার

ভারতে প্রতি ১৬ মিনিটে একজন করে নারী ধর্ষিত হচ্ছে।
২০২০ সালের তুলনায় ২০২১ সালে বেড়েছে ১৫.৩০%

বেকারত্ব, কর্মসংস্থান ও পরিযায়ী শ্রমিক

স্বাধীনতাপূর্ব ভারতে শিল্প অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি ছিল পশ্চিমবঙ্গ। ভারী শিল্প সহ প্রায় সর্বক্ষেত্রে এই রাজ্যের অবস্থান ছিল শীর্ষস্থানে, বিশেষত জুট ইঞ্জিনিয়ারিং, চামড়া কেমিক্যাল। এই ভিত্তির রাশ আলগা হতে শুরু করে ষাট এবং সত্তর দশক থেকেই। এর প্রধান কারণ ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের মাশুল সমীকরণ নীতি এবং শিল্প লাইসেন্সিং প্রথা। জাতীয় সমতার কথা বললেও বাস্তবতা ছিল পশ্চিমবঙ্গের মতো কাঁচামাল উৎপাদক রাজ্যকে শিল্পের থেকে পিছিয়ে দেওয়া।

কোন রাজ্যে কোন শিল্প হবে এবং কত ক্ষমতার হবে তা ঠিক করত কেন্দ্রীয় সরকার। এই ব্যবস্থাকে বলা হল লাইসেন্স রাজ। রাজ্যগুলির নিজস্ব শিল্পনীতি কার্যকর করার ক্ষমতা ছিল না। পশ্চিমবঙ্গে এই লাইসেন্সিং প্রথা / মাশুল সমীকরণ নীতি আরো কঠোরভাবে লাগু করা হয়েছিল। ফলত ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরবর্তী দেড় দশক জুড়ে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প অর্থনীতির কাঠামো ছিল অধোগামী।

এই নীতিদ্বয়ের অধীনে লৌহ আকরিক, কয়লা, ইস্পাত, সিমেন্টের মতো মূল শিল্প উপকরণের দাম সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এক করা হয় এবং পরিবহন খরচে ভর্তুকি দেওয়া হয়। যুক্তি ছিল সমস্ত রাজ্যের মধ্যে সমতা আনা। ফলে যেসব রাজ্যে এই উপকরণ উৎপাদিত হত তাদের বাড়তি পরিবহনের খরচের দায় বহন করতে বাধ্য করা হত। এর ফলে খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ রাজ্য তাদের ভৌগোলিক অবস্থানের সুবিধা হারালো। পশ্চিমবঙ্গ কয়লা ও বিদ্যুতের বড় উৎপাদক হওয়া সত্ত্বেও এই ক্ষতিপূরণ পেত না। ফলে শিল্প উৎপাদনের খরচ কমার বদলে অনেক ক্ষেত্রেই বেড়েযায়। পরিকল্পনা কমিশনের ১৯৮৫ সালের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে মাশুল সমীকরণ নীতির ফলে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ক্ষেত্রে বছরে গড়ে সেই সময়ের হিসেবে ২০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত বোঝা পড়েছে।

এই কাঠামোগত বৈষম্যের ফলে সরাসরি শিল্প বিনিয়োগে ঘাটতি দেখা যায়। ১৯৫৬-১৯৭৬ এই সময়কালে ভারতে কেন্দ্রীয় শিল্প লাইসেন্সের মাত্র ৬ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে বরাদ্দ হয়েছিল। ওই একই সময়ে মহারাষ্ট্র পেয়েছিল প্রায় ২২ শতাংশ এবং গুজরাট পেয়েছিল প্রায় ১৮ শতাংশ।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই বৈষম্য রাজনৈতিকভাবে আরো তীব্র হয়। ১৯৭৭-১৯৯১ এই চোদ্দো বছরে সারা দেশে অনুমোদিত ভারী ও মাঝারি শিল্পের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য ছিল গড়ে মাত্র ৭ থেকে ৮ শতাংশের মধ্যে। ওই একই সময়ে মহারাষ্ট্রের অংশ ছিল ২০ থেকে ২৩ শতাংশ এবং গুজরাটের অংশ ছিল প্রায় ১৬ থেকে ১৮ শতাংশ। এই সময়কালের শিল্প বিনিয়োগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো অনুমোদিত নতুন শিল্প স্থাপন ক্ষমতা। ১৯৮০-১৯৯০ এই সময়কালে ভারতে নতুনভাবে অনুমোদিত শিল্প স্থাপন ক্ষমতার প্রায় ৬.৫ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে বরাদ্দ হয়েছিল। মহারাষ্ট্র এই সময়ে পেয়েছিল ২৪ শতাংশ, গুজরাট পেয়েছিল প্রায় ১৯ শতাংশ। পরিকল্পনা কমিশনের রাজ্যভিত্তিক বিনিয়োগ পর্যালোচনা রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৮৫-১৯৯০ সময়কালে কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নতুন শিল্প বিনিয়োগের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ ছিল মাত্র প্রায় ৫ শতাংশ। ওই একই সময়ে মহারাষ্ট্র পেয়েছিল প্রায় ২১ শতাংশ এবং মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশা সম্মিলিতভাবে পেয়েছিল প্রায় ১৮ শতাংশ।

মাশুল সমীকরণ নীতি চালু থাকার ফলে এই বঞ্চনা আরো গভীর হয়। কয়লা এবং ইস্পাত উৎপাদক রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও নিজ রাজ্যের শিল্পকে কোনো বাড়তি সুবিধা দিতে পারেনি। পরিকল্পনা কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৭৭-১৯৮৮ এই সময়কালে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পক্ষেত্রের মোট ক্ষতির পরিমাণ ছিল ২২০০ থেকে ২৫০০ কোটি টাকা। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রেও একই ছবি দেখা যায়। ১৯৮০-১৯৯০ সময়কালে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অংশ ছিল প্রায় ৭ শতাংশের কম। একই সময়ে উত্তরপ্রদেশে এবং মহারাষ্ট্রে প্রায় ৩০ শতাংশের বেশি কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুমোদন পায়।

এই পরিসংখ্যানগুলি প্রমাণ করে যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকার পুরো সময় জুড়ে যতদিন লাইসেন্সিং প্রথা এবং মাশুল সমীকরণ নীতি কার্যকর ছিল ততদিন পশ্চিমবঙ্গে শিল্প বিনিয়োগ কাঠামোগতভাবে বঞ্চিত হয়েছে। এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেই তৎকালীন সরকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কর্মসংস্থান এবং বিকেন্দ্রীকৃত শিল্প কাঠামোর উপর ভর করে শিল্প পুনর্গঠনের কাজ চালিয়ে গেছে। বড় পুঁজির উপর নির্ভর না করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উপর জোর দেয়। গ্রামীণ এলাকার বিকেন্দ্রীভূত শিল্প গড়ে তোলাই ছিল এই কৌশলের মূল কথা।

এই কৌশলের ফল দ্রুত দেখা যায়। ১৯৮০ সালে পশ্চিমবঙ্গে নিবন্ধিত ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটের সংখ্যা ছিল প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার। ১৯৯৫ সালে ৪ লক্ষ ২০ হাজার। ২০১০ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৫ লক্ষের কাছাকাছি। ফলত কর্মসংস্থানও ধারাবাহিকভাবে বাড়তে থাকে। গ্রামীণ বাজারে লেনদেন প্রায় ৩২ হাজার কোটি এসে দাঁড়ায়। NSSO এবং রাজ্যের শিল্প দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ১৯৮০ সালে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে কর্মরত মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৮ লক্ষ। ২০০৫ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৪২ লক্ষ। ২০১১ সালে তা ছিল প্রায় ৪৮ লক্ষ। পশ্চিমবঙ্গে এই সময় হোসিয়ারি, চামড়া, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও ইঞ্জিনিয়ারিং ভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। হাওড়া, হুগলী, উত্তর ২৪ পরগণা এবং নদীয়া জেলায় ছোট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস্টার গড়ে ওঠে।

২০০০ সালের একটি কেন্দ্রীয় সমীক্ষায় দেখা গেছে যে দেশের মোট ক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ারিং উৎপাদনের প্রায় ১৪ শতাংশ কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসছিল।

বড় শিল্পের ক্ষেত্রে চিত্রটি ছিল ভিন্ন। কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণের কারণে একের পর এক প্রকল্প আটকে যায়। বৃহৎ শিল্পের অনুমেদন পেতে দীর্ঘসূত্রিতায় পদে পদে বিপদে পড়তে হয় পশ্চিমবঙ্গকে।

এই অভিযোগ প্রায়ই করা হয় যে বামফ্রন্ট আমলে পশ্চিমবঙ্গে বড় শিল্প বা আধুনিক শিল্প আসেনি।

১৯৯৪ সালে শিল্প নীতির ফলে প্রথম যে পরিবর্তনটি দেখা যায় তা হলো শিল্প বিনিয়োগের প্রবণতায়। ১৯৯৪ থেকে ২০০৪ সাল—এই এক দশকে প্রায় ৩৫ শতাংশ শিল্প ইউনিটের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, এই বৃদ্ধির বড় অংশ এসেছিল ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প থেকে। ২০০৫ থেকে ২০১০ সময়কালে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প বৃদ্ধির গড় হার ছিল বছরে প্রায় ৭.৫ শতাংশ। এই সময় সর্বভারতীয় গড় ছিল প্রায় ৬.৮ শতাংশ।

এই অগ্রগতি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই পেট্রোকেমিক্যাল এবং অটোমোবাইল শিল্পে নতুন সম্ভাবনার সুযোগ তৈরী হয় পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু ২০০৪-এর পর গভীর ষড়যন্ত্র শুরু হয়। ধ্বংসাত্মক আন্দোলন শুরু করে রাজ্যের বর্তমান শাসক দল। সঙ্গী বর্তমান কেন্দ্রের শাসক দল সহ অন্য কয়েকটি রাজনৈতিক দল। চরম অরাজকতা তৈরী করে ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় আসে রাজ্যের বর্তমান শাসক দল।

শুরু হয় বিনিয়োগের সঙ্কট। ২০১১ থেকে ২০১৬ সময়কালে এই রাজ্যে নতুন মাঝারি শিল্প প্রকল্পের সংখ্যা ছিল মাত্র ১২টি। একই সময়ে গুজরাটে ছিল ৪৮টি, তামিলনাড়ুতে ৩৬টি। বরং এই রাজ্যে শিল্প বন্ধের প্রবণতা বাড়ে। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ শিল্প ইউনিটের সংখ্যা ছিল ৮৪০০। ২০২১ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ১৭৬০০। ক্ষুদ্র শিল্পও এই সময়ে সঙ্কটে পড়ে। ২০১১ থেকে ২০২৩ সংগঠিত শিল্পের সংখ্যা ১২৪০০ থেকে কমে দাঁড়ায় ১১৮০০-তে। ২০১২ থেকে ২০২০ এই সময়কালে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিট কার্যত উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। ফলে ৯ লক্ষ শ্রমিক কাজ হারায়। ২০২৩ সালে এসে পশ্চিমবঙ্গে সংগঠিত শিল্পে কর্মসংস্থান কমে দাঁড়ায় প্রায় ১৯ লক্ষ এবং ক্ষুদ্র শিল্পে নেমে আসে ৪৪ লক্ষে।

বামফ্রন্ট আমলে বৈষম্যমূলক নীতির মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের বিকল্প ভিত্তি গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে বামফ্রন্ট পরবর্তী সময়ে সেই শিল্প ভিত্তি ভেঙে পড়ে। বিনিয়োগে স্থবিরতা দেখা দেয়। শিল্প বন্ধ হয়। কর্মসংস্থান সঙ্কুচিত হয়। রাজ্যের শাসক দলের শিল্প ধ্বংসের নীতি রাজ্যের যুব সমাজের ভবিষ্যৎকে অনেকাংশেই বিপন্ন করে দেয়।

কেরালার অভিজ্ঞতা

দু'বারের বাম সরকারের শিল্প উন্নয়ন অভিজ্ঞতা দেখায় যে স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী ও ধারাবাহিক নীতি থাকলে সীমিত সম্পদের মধ্যেও শিল্পায়ন সম্ভব। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ছিল মূল লক্ষ্য। সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও স্থানীয় উদ্যোগকে শক্তিশালী করা কেরালার বাম সরকারের মূল শিল্প দৃষ্টিভঙ্গী।

কেরালার ও পশ্চিমবঙ্গের কর্মসংস্থানে তুলনামূলক চিত্র ঃ

সূচক (%)	২০১৬ পশ্চিমবঙ্গ	২০১৬ কেরালা	২০১৬ জাতীয় গড়	২০২৩ পশ্চিমবঙ্গ	২০২৩ কেরালা	২০২৩ জাতীয় গড়	তথ্যসূত্র
নিয়মিত মজুরি শ্রমিক	৩১	৪৮	৪১	২৮	৫১	৪৩	NSSO PIFS
যুব বেকারত্ব	১২.১	৭.৫	৯.৬	১৪.২	৬.৮	১০.২	CMIF PIFS
শিক্ষিত বেকারত্ব	১৬.২	৮.৯	১২.১	১৮.৪	৭.৬	১৩.৮	NSSO PIFS

পরিযায়ী শ্রমিক ও বর্তমান অবস্থান

বিভিন্ন তথ্যসূত্র অনুযায়ী প্রায় ৬৫ লক্ষ বাঙালি শ্রমিক জীবিকার খোঁজে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, দিল্লি, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, ওড়িশা ও কেরালার মতো রাজ্যে কাজ করতে যায়। দুঃখজনকভাবে কেন্দ্রের শাসক দল শাসিত রাজ্যগুলোয় এই পরিযায়ী শ্রমিকরা অনেক সময় বিদ্বেষের শিকার হন। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, অসমের মতো রাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের উপর 'অপমান', আক্রমণ এমনকি বহিষ্কারের ঘটনাও লিপিবদ্ধ হয়েছে। বহিরাগত/ বাংলাদেশী তক্‌মা লাগিয়ে বাঙালি শ্রমিকদের জীবনকে অসুরক্ষিত করে তোলা হয়েছে।

অন্যদিকে, কেরালা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কেরালায় প্রায় ৪০ লক্ষের মতো শ্রমিক, যাদের উল্লেখযোগ্য অংশ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার থেকে আগত। কেরালায় পরিযায়ী শ্রমিকরা কেবল শ্রমিক নয়, তাঁরা সমাজের অংশ। সরকারী হাসপাতাল থেকে স্কুল—সব জায়গার তাঁরা স্থানীয় নাগরিকের সমান অধিকার ভোগ করেন। রাজ্য সরকার এমনকি মোবাইল স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও বিশেষ শ্রমিক হেল্পলাইন চালু করেছে যাতে অন্য রাজ্যের শ্রমিকরা ভাষা বা অঞ্চলের কারণে বঞ্চিত না হন। এই তুলনা শুধু প্রশাসনিক নয়, মানসিকতারও পার্থক্য। কেরালা সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের 'মাইগ্র্যান্ট' নয়, বরং 'অতিথি শ্রমিক' (Athithi Thozhilali) বলে উল্লেখ করে। এই একটি শব্দেই প্রতিফলিত হয় মানবিকতার দর্শন।

"একদিকে বাংলার যুবকরা গুজরাটে অপমানিত

অন্যদিকে কেরালায় তারা সম্মানিত অতিথি" □

আশিস মিত্র, সৌমেন্দ্র চক্রবর্তী, রজত সাহা

তৃতীয় পৃষ্ঠার পরে

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আলোচনা

বয়সী মেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে, গিয়ে বিয়ে করেছে, প্রেগন্যান্ট হয়েছে। প্রেগনেন্সি আসা মাত্র তারা ওই দাম্পত্য যাপন করতে পারেনি, সাহস নেই, ভয় পেয়েছে, বাড়িতে আবার ওই অবস্থায় ফিরে এসছে। স্কুল টুল সব বন্ধ হয়ে গেছে এবং ওই কিশোর অবস্থায় সে প্রেগন্যান্ট, তার যে স্বাস্থ্যের দুর্গতি হওয়ার কথা সেগুলি সব হয়েছে।

অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে, এই যে দুটো বছর স্কুলগুলোকে বন্ধ করে রাখা হলো কোভিডের অজুহাতে, কোনও অল্টারনেটিভ প্ল্যানিং সরকারি কোনো কমিটির পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি। তার পরিণাম হচ্ছে মেয়েগুলোর পালিয়ে যাওয়া।

সেই চারটে গ্রামে আমরা যখন গিয়ে কাজ করছি, তখন নারীদের শরীর শিক্ষা জীবিকা আয় হিংসা সব সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রশ্ন আমরা করেছিলাম। জানতে চেয়েছিলাম আপনাদের জেনারেল ফুড হ্যাবিট কি, আপনারা কি খান? মানে নিত্য খাবারটা কি? প্রত্যেকটা গ্রামের মহিলারা বললেন তারা মাছ বা মাংস মাসে একবার হয়তো খান। অর্থাৎ মাছ মাংস ডিম খাওয়া হয় না, এবার শোনা যাক নিরামিষ খাবারটা কি? ভাত, আলুর ঝোল, সঙ্গে টমেটো পোড়া বা টমেটো সেদ্ধ । আলু, ভাত আর টমেটো যার শরীরে ৩০ দিন ঢুকছে, সেই মানুষটার শরীর পুষ্টি পাবে কোথা থেকে?

ডালের মতো একটা ভেজ প্রোটিনের সোর্স-ও রেশনে দেওয়া হয় না, এবং ওদের পক্ষে সেগুলো কিনে খাওয়া সম্ভব না। 'কিশোরী শক্তি যোজনা' বলে একটা যোজনা চালু হয়েছিল আই.সি.ডি.এস সেন্টার থেকে সেটা ডিস্ট্রিবিউট করার কথা ১১ থেকে ১৮ বছর বয়সী মেয়েদের। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আই.সি.ডি.এস সেন্টার থেকে এখন সেটা ডিস্ট্রিবিউশন হয় না ।

প্রত্যেকদিন গর্ভবতী মাকে এবং যে মা স্তন্যপান করাচ্ছেন বাচ্চাকে, মানে বাচ্চা প্রসব করার পরেও ছ'মাস তাঁকে একটা করে ডিম দেওয়ার কথা, সব জায়গায় দেওয়া হয় না। আই.সি.ডি.এস সেন্টারগুলোতে বাচ্চাগুলোকে একদিন ছাড়া একদিন একটা ডিম ও একটা ডিম হাফ করে দেওয়ার কথা, বেশ কিছু জায়গায় দেওয়া হচ্ছে না। সারা সপ্তাহটাতেই হাফ ডিম দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এইটাই পশ্চিমবঙ্গের দস্তুর এবং সত্যি কথা বলতে ভারতেরও বেশ কিছু রাজ্যের।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে অসাম্যের হিসাব যদি গোটা ভারতে করতে হয় তাহলে আমরা মধ্যবিত্তরা একদম আম্বানি আদানির পরের সেকশনে ঢুকে যাব। কিন্তু জনসংখ্যার বেশির ভাগটা, মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ, তাঁরা কিন্তু আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে আছেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য সব কেনার ক্ষমতা আমাদের মতো মধ্যবিত্তদের থাকলেও দেশের বিরাট সংখ্যক জনগণের কিছু কেনার ক্ষমতা নেই এবং সংবিধান অনুযায়ী সেগুলো জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে, তাঁদের কেনার কথাও নয়। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে যখন চর্চা হয়—যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো একটা ভাতা, সেটা ভিক্ষা। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কেউ কেউ আমরা নিজেদের অজান্তেই বলি, লক্ষণীয়ভাবে দেখবেন, যখন বিধবা ভাতা দেওয়া হতো বাম আমল থেকে, যখন বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হতো, তখন এই জাতীয় কথা কখনো শুনেছেন? যে এগুলো ভিক্ষা, এগুলো ভাতা।

কখনো মনে হয়েছে, কেন শোনেননি? বামপন্থীরা বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা কখনো ভিক্ষা বা খয়রাতি হিসেবে দেখেনি। কারো কারো ধারণা এগুলি বোধহয় দলীয় রাজনীতির একটা বহিঃপ্রকাশ। আমি খুব দৃঢ়তার সাথে এই কথাটা বলতে চাই যে এটা আসলে কোনো দলীয় রাজনীতির দান নয়। এটা পরিষ্কার, অত্যন্ত ওয়েল ডিফাইন্ড এমন একটা কাজ, যেটা লেখা রয়েছে আমাদের সংবিধানে। কোনো পার্টির ইশতেহারের ফসল এটা নয়, কোনো ভাতাই নয়। সংবিধানে কিছু ডিরেকটিভ প্রিন্সিপালস আছে। ডিরেকটিভ প্রিন্সিপালসের জন্য যেগুলো না পালন করলে রাষ্ট্রকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু ডিরেকটিভ প্রিন্সিপালসে এমন কিছু নির্দেশ আছে যেগুলো আসলে একটা রাষ্ট্রের নৈতিক অবস্থান বা তার স্পিরিটকে ব্যাখ্যা করে। ডিরেকটিভ প্রিন্সিপালস-এ সেই কথাগুলো লেখা আছে। শিক্ষা হলো মৌলিক অধিকার, ২০০২ সালের আগে সেটাও ডিরেকটিভ প্রিন্সিপালসে ছিল। এই যে ভাতা দেওয়ার যে প্রচলন সেটা যে-কোনো শাসক দলই দিক না কেন, জানবেন তারা সংবিধান মেনে আসলে নৈতিকভাবে বাধ্য হয়ে দেয়। তাদের মতাদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়ে তারা দিচ্ছে, এমনটা নয়। ডিরেকটিভ প্রিন্সিপালসে খুব স্পষ্ট করে লেখা আছে, রাষ্ট্র তার আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে এমন কিছু পাবলিক অ্যাসিস্টেন্স দেবে। এই শব্দগুলো কিন্তু সাংবিধানিক শব্দ। পাবলিক অ্যাসিস্টেন্স দেবে, যে অ্যাসিস্টেন্সগুলো এই দেশের নাগরিকদের বেঁচে থাকার জন্য সহায়ক। কাদের দেবে? তিনটে উদাহরণ ওই ধারাটাতে উল্লেখ করা আছে। বৃদ্ধ মানুষ, বিশেষভাবে চাহিদাসম্পন্ন যাঁদের আমরা প্রতিবন্ধী মানুষ হিসেবে চিনি তাঁরা এবং যাঁরা খুব দীর্ঘকালীন কোনো অসুস্থতার মধ্যে আছেন তাঁরা। তাঁদেরকে এই পাবলিক অ্যাসিস্টেন্সগুলো রাষ্ট্র দেবে। আর দেবে কাদের—অনুচিত অভাব ঘটছে যে নাগরিকদের, তাঁদের।

যে ভারত লিঙ্গ বৈষম্যে ১৩১তম স্থানে থাকে, যে ভারত মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যোগদানে বৈষম্যে ১৪৪তম অবস্থানে থাকে, যে দেশ স্বাস্থ্যে লিঙ্গবৈষম্যের কারণে ১৪৩তম স্থানে, যে দেশ ১১০তম অবস্থানে থাকে শুধুমাত্র স্কুল শিক্ষায় অংশগ্রহণ লিঙ্গ বৈষম্যের প্রশ্নে, যে ভারত নারীদের মন্ত্রীসভায় স্থান পাওয়ার ক্ষেত্রে ১৩৮তম অবস্থানে থাকে লিঙ্গ বৈষম্যের প্রশ্নে, সেই ভারতে নারীদের সঙ্গে অনুচিত অভাব ঘটছে, নারীদের অন্যায় বৈষম্যমূলক বিপন্নতা এবং অভাবের সম্মুখীন করা হচ্ছে এই নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকে? থাকে না। যেহেতু থাকে না সেইজন্য এই রাষ্ট্রকে পাবলিক অ্যাসিস্টেন্স ক্যাশ ট্রান্সফারের মতো জিনিস দিয়ে দিতে হবে। দিতে সে বাধ্য।

যে-কোনও রাজনৈতিক দল সরকারে আসুক না কেন তারা প্রত্যেকেই বাধ্য। উপকার নয়। 'আমি গরিব মানুষকে টাকা দিয়ে দিয়েছি', এই যে বয়ান আমরা মুখ্যমন্ত্রীর মুখ থেকে মাঝে মধ্যেই শুনি, এই বয়ানটা অগণতান্ত্রিক, ভিত্তিহীন, নাগরিকের হকের মর্যাদার বিরোধী এবং জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের যে স্পিরিট, যে দর্শন তার বিরোধী।

যারা দিন আনে দিন খায়, যাদের ঘরে ওইটুকু অ্যাসিস্টেন্স না পৌঁছালে আজকে হাঁড়িটা চড়বে না, তাদেরকে অবলীলায় এত সহজে বলা যায় না, এত অসম্মান করা যায় না।

যে পিতৃতন্ত্রের কথা বলছিলাম না, যে ওই পা তুলে বসে কথা বলা যায় যে মেয়েরা তো পালিয়ে যায়, ওই পিতৃতন্ত্রের আরেকটা রূপ হচ্ছে, যারা প্রান্তিক, যারা দরিদ্র, তাদেরকে আমরা খুব সহজে সাবহিউম্যান একটা ক্যাটেগরিতে ফেলে দিতে পারি। আমরা ধরেই নিই এদের কোনো পলিটিক্যাল ওপিনিয়ন থাকতে পারে না। এদের কোনো আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে পারে না।

আসলে বেঁচে থাকার যে লড়াইটা সেই লড়াইটা এত কঠিন, সেখানে ওই পাবলিক অ্যাসিস্টেন্সটুকু না পেলে তার চলবে না। এবং তার পাশাপাশি যে বিকল্প রাজনীতির কথা বামপন্থীরা বলছেন, প্রান্তিক মানুষদের মর্যাদা, সম্মান দেওয়ার কথা বলছেন, তা তাদের কাছে পৌঁছানোর ঘাটতি থাকছে বলেই, একটা বৃহত্তর অংশের মানুষকেও আমাদের লড়াইয়ের সাথে আবৃত করা যাচ্ছে না। এই জায়গাটা আমাদেরকে আত্মসমালোচনার মাধ্যমে বুঝতে হবে। আর রাষ্ট্র তো চলছেই শ্রমজীবীদের শোষণ করার জন্য।

আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবসের প্রসঙ্গে বলতে হলে দুটি শব্দ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'রুটি' এবং 'শান্তি'। এই দুটি শব্দ স্লোগানে আনতে পারে নারীরাই। তাঁদের জীবনে শুধুমাত্র লিঙ্গ পরিচয়ের জন্য অশান্তির শেষ নেই, আর রুটির শেষ টুকরো তো সব সময়েই তাঁদের জন্য বরাদ্দ। রাষ্ট্রের কাছ থেকে আদায় করার জন্য নারী মুক্তির দর্শন ও বামপন্থী শক্তিকে রুটি এবং শান্তির দাবিতে সব মানুষের মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার অধিকার রক্ষার দাবিতে লড়াই করতে হবে। আর এটাই সময়ের দাবি। আমি আশা করব আপনারা যাঁরা এখানে আছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই এই লড়াইয়ের শরিক। এই লড়াইটা আমরা একসঙ্গে লড়ছি এবং আগামী দিনেও লড়ব। □

চতুর্থ পৃষ্ঠার পরে

কেন্দ্রীয় সরকারের মার্কিনমুখী বিদেশ নীতি

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি ও আর্থিক সার্বভৌমত্ব—ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক চুক্তিতে, বিশেষ করে—মেধাস্বত্ব (Intellectual Property Rights) সংক্রান্ত কঠোর শর্ত, কৃষি ও খুচরো বাজারে বিদেশী কর্পোরেশনের প্রবেশ এবং ডিজিটাল অর্থনীতিতে মার্কিন কোম্পানিগুলির প্রভাব। Amazon, Walmart, Google-এর মতো কোম্পানিগুলির আধিপত্য ভারতের ক্ষুদ্র ব্যবসা ও ডেটা সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করছে। এই প্রক্রিয়া ভারতের অর্থনীতিকে একটি 'নব্য-উপনিবেশিক' কাঠামোর দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ক্রমশ বহুজাতিক কর্পোরেশন ও বিদেশী শক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে।

২৮ ফেব্রুয়ারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইজরায়েল ইরানের ওপর বিপুল বোমাবর্ষণ শুরু করে। ইরানের ওপর বোমাবর্ষণ ও সে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান আয়াতোল্লা খামেনেইকে হত্যা করার জন্য মার্কিন সামরিক হামলার বিরোধিতা বা নিন্দা করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। অথচ ইরানের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রাচীন কাল থেকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে এই অধীনতার বিদেশনীতি গত ১২ বছর ধরে মোদী সরকার অনুসরণ করে চলেছে। এই যুদ্ধের কারণে ভারতের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার খরচ বাড়লেও কর্পোরেটদের লাভ বাড়ছে।

হিন্দুত্ব ও সাম্রাজ্যবাদ—মোদী সরকারের বিদেশ নীতির সঙ্গে অভ্যন্তরীণ রাজনীতিরও একটি সংযোগ রয়েছে। হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে একটি স্বার্থগত মিল রয়েছে—উভয়ই কর্পোরেট পুঁজির সম্প্রসারণকে সমর্থন করে। এই জোট শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে এবং বৈষম্য বাড়ায়।

কেন্দ্রীয় সরকারের মার্কিনমুখী বিদেশ নীতির প্রধান সমালোচনাগুলি হলো—কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের ক্ষয়, সামরিকীকরণ বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক নির্ভরতা বৃদ্ধি, আঞ্চলিক সংঘাতের ঝুঁকি বৃদ্ধি, তৃতীয় বিশ্বের ঐক্যের অবক্ষয়।

রাজ্যের আগামী রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রেক্ষিতে নির্বাচকদের কিছু নির্দিষ্ট বিষয় খতিয়ে দেখা দরকার—"দেশের স্বাধীন বৈদেশিক নীতি কে রক্ষা করবে?"—কারণ বৈদেশিক নীতি শুধু কূটনীতি নয়, এটি দেশের অর্থনীতি, নিরাপত্তা এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। যে দল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে চায়, কোনো বৃহৎ শক্তির (যেমন United States বা Russia) প্রভাবমুক্ত থেকে দেশের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়, তারাই প্রকৃত অর্থে স্বাধীন বৈদেশিক নীতি রক্ষা করতে পারে।

যে দল অযথা সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোটে জড়িয়ে পড়ার বিরোধিতা করে এবং যেমন QUAD বা দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা চুক্তির ক্ষেত্রে সতর্ক অবস্থান নেয়, তারা সাধারণত স্বাধীন নীতির পক্ষে থাকে, BRICS, Non-Aligned Movement-এর মতো প্ল্যাটফর্মে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষা করতে চায়, তারা বহুমুখী ও স্বাধীন কূটনীতিকে গুরুত্ব দেয়, বিশ্বের যে-কোনো আগ্রাসনের বিরুদ্ধে (যেমন মধ্যপ্রাচ্য বা লাতিন আমেরিকায়) স্পষ্ট অবস্থান নেয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তিধর দেশের আধিপত্যের বিরোধিতা করে, তারা স্বাধীন বৈদেশিক নীতির ধারক হতে পারে।

বৈদেশিক নীতি অর্থনৈতিক বা জোট নীতির সঙ্গে যুক্ত। যে দল বহুজাতিক পুঁজির উপর নির্ভরতা কমিয়ে স্বনির্ভরতা বাড়াতে চায়, তারা তুলনামূলকভাবে স্বাধীন অবস্থান নিতে পারে। নির্বাচকদের শুধু দলীয় প্রচার নয়, বাস্তব নীতি, অতীত ভূমিকা এবং আন্তর্জাতিক ইস্যুতে তাদের অবস্থান বিচার করতে হবে। মূল প্রশ্ন হওয়া উচিত ঃ কে দেশের সার্বভৌমত্বকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে? কে বিদেশী শক্তির চাপের কাছে নতি স্বীকার করছে না? কে দেশের মেহনতি মানুষের স্বার্থ রক্ষা করে বৈদেশিক নীতি গড়তে চায়?

এই ভিত্তিতে বিচার করলেই বোঝা যাবে—কোন দল বা জোট সত্যিই দেশের স্বাধীন বৈদেশিক নীতি রক্ষা করতে সক্ষম। □

চতুর্থ পৃষ্ঠার পরে

কৃষি যখন সঙ্কটে

ঢেলে সাজানো হয়—প্রতিটি ব্লকে কৃষি উন্নয়ন আধিকারিকের পোস্ট এবং আলাদা দপ্তর তৈরী হয়। ১২০০ জন কৃষক পিছু একজন করে সরকারী কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক পদ তৈরী করে কৃষকদের উন্নতিপ্রথায় চাষবাসে সহায়তা করা হয়।

● প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল হানির ক্ষতিপূরণে শস্যবীমা চালু হয়।

● ফসলের দাম পড়ে গেলে MSP-র সাথে অতিরিক্ত ভর্তুকি দিয়ে ফসল কেনার ব্যবস্থা করা হয়।

● স্থানীয় কৃষকদের চাহিদা অনুসারে বীজের জোগান দেওয়ার জন্য সরকারী বীজ-খামারগুলির পরিকাঠামো উন্নত করা—কৃষি শ্রমিক নিয়োগ করা হয়—প্রতিটি খামারে ১৫ জন করে। পরে তাদের সকলকে স্থায়ীকরণ করা হয়।

● যাটোর্ধ্ব কৃষকদের জন্য বার্ধক্যভাতা চালু হয়। ১ লক্ষ ১৭ হাজার কৃষককে প্রতি মাসে এই ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

● কৃষককে চাষের উপকরণ সার, বীজ, জৈব সার ইত্যাদি মিনিকিট আকারে বণ্টন।

● খাদ্যে ঘাটতি রাজ্য খাদ্যশস্য উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। মাছ, বনসৃজন, সবজি উৎপাদনেও দেশের মধ্যে প্রথম হয় রাজ্য।

● কৃষিভিত্তিক শিল্পের চাহিদা তৈরী হয়। এক্ষেত্রে চাষযোগ্য জমি অধিগ্রহণ করলে বাজার মূল্যের তিন গুণ এবং ৩০০ দিনের মজুরির সিদ্ধান্ত চালু হয়।

● ২০১১-র পরবর্তীতে জমিদার জোতদাররা আবার সক্রিয় হয়। বর্গা, পাট্টাদার উচ্ছেদ, জমি কেড়ে নেওয়া, ফসল লুঠ, চাষ বন্ধ করে দেওয়ার মতো ঘটনা নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়ায়।

● ফিল্ড স্তরে শূন্যপদের কারণে সরকারী কৃষি পরিষেবা আর কৃষকের মাঠে পৌঁছাচ্ছে না। কৃষি খামারগুলিতে কৃষি শ্রমিক নিয়োগ না হওয়ায় স্থানীয় কৃষক উন্নত মানের বীজ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

● সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি দুর্বল হওয়ার কারণে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ অপ্রতুল হওয়ায় বন্ধন, আশীর্বাদ, এল এন্ড টি-র মতো মাইক্রো ফিনান্সের জালে জড়িয়ে পড়ছেন কৃষক।

● ফসলের উৎপাদন ব্যয় বেশি হওয়া সত্ত্বেও কৃষক উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না। বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে ফড়েরা; ফলে ৪০০/৫০০ টাকা কম দামে অভাবী বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন কৃষক।

● সারের দামের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় কালো বাজারে বাড়তি দাম দিয়ে সংগ্রহ করতে হচ্ছে।

● ১৯৬৮ সালের খাদ্য শস্য ও কৃষিপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন করে ২০১৪ সালে বৃহৎ ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া কারবারের সুবিধা দেওয়া এবং ২০১৭ সালে আরও সংশোধন করে প্রাইভেট মার্কেট করার ছাড়পত্র দেওয়া হয়। ২০২০-তে কেন্দ্র কালা কৃষি আইন প্রণয়ন করে যা করতে চেয়েছিল তা ৬ বছর আগেই একপ্রকার চালু হয়েছে এ রাজ্যে।

আলু চাষীরা সঙ্কটে

● পশ্চিমবঙ্গে প্রধান অর্থকরী ফসল আলু; প্রায় ৪.৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়—এবছর আবহাওয়া অনুকূল থাকায় আলুর ফলন ভালো হচ্ছে—মোটামুটি ১ কোটি ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন আলু উৎপাদনের সম্ভাবনা। পশ্চিমবঙ্গে ৫৮০টি হিমঘর আছে—তার মধ্যে আলু স্টোর করে ৪৮০-৯০টি। তাদের সংরক্ষণের ক্ষমতা (Storage Capacity) ৭০-৮০ মেট্রিক টনের বেশি নয়—ফলে বিপুল পরিমাণ আলু উদ্বৃত্ত।

● ভিনরাজ্যে আলু যাওয়ার সরকারী বাধার ফলে ভিনরাজ্যের আলুর বাজার দখল করে নিয়েছে উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাবের মতো রাজ্য।

● সরকার ৩০ শতাংশ আলু কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষণের ঘোষণা করলেও বেশিরভাগ হিমঘর ফড়েদের মাধ্যমে কম দামে স্টোর করে নেয়। ফলে কৃষককে হয়রান হতে হচ্ছে। হিমঘর নির্দিষ্ট মাপের ছাড়া আলু না নেওয়ায় আরও অসুবিধা হচ্ছে। □

দক্ষিণপন্থী শাসন শ্রমিকের কাছে বিষময়

উৎসর্গ মিত্র

২০১১ সালে রাজ্যে বাম সরকারের পতনের পর নব নির্বাচিত মুখমন্ত্রীকে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছিলেন গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রোটোকলের কারণে তিনি এটা করেছিলেন ভাবলে ভুল হবে। আসলে এটা এসেছিল দুটি কারণে---(১) বামপন্থীরা চিরকালই বিজেপি এবং আর এস এস-এর ঘোষিত শত্রু এবং (২) বাম আমলে শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ মোদীর রাজ্য গুজরাটকেও ছাড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম করেছিল। সিঙ্গুর প্রকল্প আটকে দিয়ে, তাকে গুজরাটের সানন্দে যাওয়ার রাস্তা করে দিয়ে সে যাত্রায় মোদীর 'সম্মান' রক্ষা করেছিলেন মমতা। আজকের মতো অন্য রাজ্যগুলি এ রাজ্যের সস্তা শ্রমিক পেতই না রাজ্যে মমতার সরকার না থাকলে।

কর্মসংস্থানের সুযোগ সংক্রান্ত 'জাতীয় নমুনা সমীক্ষা'র রিপোর্ট অনুসারে ২০০৪-১১ কালপর্বে দেশে মোট ৫৮,৭০,০০০ কাজের সুযোগ তৈরী হয়েছিল। এর মধ্যে শুধু এ রাজ্যেই হয়েছিল প্রায় ২৪ লক্ষ কাজের সুযোগ, অর্থাৎ মোটের ৪০ শতাংশ। গুজরাটে হয়েছিল মাত্র ১৫ লক্ষের কাছাকাছি। বিনিয়োগও বেড়েছিল এর ফলে। ২০০৫ সালে রাজ্যে বিনিয়োগ এসেছিল ২,৫১৫.৫৮ কোটি টাকা। পরের বছরগুলিতে তা আরও বৃদ্ধি পায়। ২০০৭ সালে ৫,০৭২.২৬ কোটি, ২০০৮ সালে ৪,৪৩৪.৫ কোটি, ২০১০ সালে ১৫,০০০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ বাস্তবায়িত হয়। ২০১১ সালে রাজ্য দেশের মধ্যে ২ নম্বরে ছিল শিল্প বিনিয়োগে আর এখন ১৫ নম্বরে। প্রতি বছর ঘটা করে 'শিল্প সম্মেলন-এর নামে মানুষের করের টাকায় সার্কাস হয় বটে, শিল্প আর শ্রমিকের অবস্থা তাতে কিছুমাত্র পালটায় না। ২০১৫-২৫-এর মধ্যে এমন ১১টি সম্মেলন হয়েছে। রাজ্য সরকারের মতে সব মিলিয়ে সেগুলিতে প্রস্তাব এসেছে নাকি ১৮ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। ভিন্ন রিপোর্ট দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের 'ডিপার্টমেন্ট ফর প্রোমোশন অফ ইণ্ডাস্ট্রি অ্যাণ্ড ইন্টারনাল ট্রেড'। তাদের মতে এই কালপর্বে বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে মাত্র ৮২,৫০৫ কোটি টাকার, অর্থাৎ মমতা ব্যানার্জীর ঘোষণার মাত্র ৪ শতাংশ। সবটাই প্রস্তাব। বাস্তবায়নের কোনও বিশ্বাসজনক রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায়নি শুধুমাত্র কিছু বাগাড়ম্বর ছাড়া।

সুতরাং রাজ্যে এখন নতুন কোনও কর্মসংস্থান নেই। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী শুধু ২০২১-২৩ কালপর্বেই এ রাজ্যে কাজ হারিয়েছেন প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ। বেকারি বাড়ছে হু হু করে। কাজের মধ্যে যে শ্রমিকেরা টিকে আছেন কোনও মতে, তাঁদের অবস্থাও খুব খারাপ। তাঁদের দৈনিক মজুরি এখন এখানে অত্যন্ত কম। আবার সমান কাজ করে নারী শ্রমিকদের মজুরি আরও কম। বিশেষ করে দেশে শ্রম কোড চালু হওয়ার পরে এবং রাজ্যের মমতা সরকার ঘুরপথে সে কোডের সমর্থক হওয়ার ফলে এ রাজ্যের শ্রমিকদের অবস্থা বেশ খারাপ। আজকের শ্রমিকদের কাছে মূর্তিমান বিপদ এই শ্রমকোড। শ্রম আইনের মৌলিক নীতি হলো শ্রম বাজারে দুর্বল পক্ষকে সুরক্ষা দেওয়া এবং তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা, যাতে তারা বেতন এবং কাজের পরিবেশ নিয়ে আলোচনার সময়ে ন্যায্য অবস্থানে থাকে। কিন্তু যখন অসংগঠিত ক্ষেত্রের কথা আসে, তখন শ্রম আইনের এই মৌলিক নীতিটিও মানা হয় না। সব বিরোধী দলকে অস্বীকার করে, সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নকে অন্ধকারে রেখে শুধু ক্ষমতার জোরে শ্রমিক, কর্মচারী মারার দানবীয় শ্রম কোড দেশে চালু হয়ে গিয়েছে গায়ের জোরে। এই শ্রমকোডের ফলে একদিকে যেমন অসংখ্য শ্রমিক নতুন করে অসংগঠিত তালিকায় ঢুকে যাবে, অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য তেমনই নতুন নতুন বিপদও সামনে এসে হাজির হবে।

সংক্ষেপে বললে এর প্রধান বিপদগুলো হলো ঃ

● **চাকরির নিরাপত্তা হ্রাস ঃ** নতুন কোডগুলির ফলে ছাঁটাই করা সহজ হতে পারে, যা চাকরির নিরাপত্তাহীনতা বাড়াবে।

● **চুক্তির ভিত্তিতে কাজ বৃদ্ধি ঃ** স্থায়ী কর্মসংস্থানের বদলে চুক্তির ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগের প্রবণতা বাড়তে পারে, যার ফলে শ্রমিকরা কম সুবিধা এবং নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পড়বে।

● **কর্মঘণ্টা বৃদ্ধি ঃ** কাজের সময় বেড়ে যেতে পারে, যা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

● **বেতন ও সামাজিক সুরক্ষা কমে যাওয়া ঃ** কর্মীদের হাতে পাওয়া বেতনের পরিমাণ কমে যেতে পারে এবং সামাজিক সুরক্ষা সুবিধা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

● **ট্রেড ইউনিয়নগুলির ক্ষমতা হ্রাস ঃ** ট্রেড ইউনিয়নগুলির ক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণে শ্রমিকরা সম্মিলিতভাবে তাদের অধিকার আদায়ে দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।

● **শোষণ বৃদ্ধি ঃ** মালিকদের স্বার্থ বেশি সুরক্ষিত হওয়ার কারণে শ্রমিকদের শোষণ ও নির্যাতনের শিকার হওয়ার ঝুঁকি বাড়তে পারে।

● **নিরাপত্তাহীন কর্ম পরিবেশ ঃ** কোডের অধীনে কর্মপরিবেশ এবং সুরক্ষার নিয়ম শিথিল হতে পারে, যা শ্রমিকদের জন্য বিপদসংকুল কাজের পরিবেশ তৈরী করতে পারে।

এই শ্রম কোডের বিপদ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা ও প্রতিরোধের আন্দোলন শুরু হয়েছে। যেভাবে বিজেপি সরকার গরিব, খেটেখাওয়া মানুষকে প্রতিদিন মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে সব অংশের শ্রমিকের রক্ত ঘামের বিনিময়ে বন্ধু পুঁজিপতিদের মুনাফার পাহাড় গড়ে দিতে সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে সারা দেশেই পথে নামছেন মানুষ। হচ্ছে ধর্মঘট, কর্মবিরতি, ধর্ণা। আমাদের রাজ্যও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এ রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলন সংগঠিত করতে গেলেই মমতা ব্যানার্জীর প্রশাসন ঝাঁপিয়ে পড়ে সেগুলিকে দমন করতে। তা সত্ত্বেও আন্দোলন চলছে মূলত বামপন্থী শ্রমিক-কর্মচারী সংগঠনগুলির নেতৃত্বে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিও তাতে শামিল। কিন্তু যেহেতু মমতা ব্যানার্জী নিজে শ্রম কোডের পক্ষে (কারণ সংসদে বা রাজ্যে, কোথাওই এর বিরুদ্ধে তাঁর দলের কোনও কথা নেই বরং ঘুরপথে সেটি কার্যকর করার চেষ্টা চলছে), সেহেতু রাজ্যের শ্রমিকদের অবস্থা শোধরানোর কোনও পরিস্থিতি নেই। সরকারের কাছ থেকে 'ফ্রী হ্যাণ্ড' পেয়ে গিয়ে মালিকেরা এখন এখানে নিশ্চিন্তে শ্রমিকদের শোষণ করে, তাদের স্বল্প বেতনটুকু দিয়েই তারা খালাস হয়, আর যারা অধিকারের কথা বলতে যায়, তাদের বরখাস্ত করে। ফলে দলে দলে শ্রমিক এখন পাড়ি জমাতে বাধ্য হচ্ছেন ভিন্ রাজ্যের দিকে।

শ্রমিকের শ্রম ও অধিকার চুরি শুধু ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প বা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে নয়। সরকারের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে এ ঘটনা ঘটছে উত্তর বঙ্গের চা শিল্পেও। উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি নির্ভরশীল টি, টিম্বার এবং ট্যুরিজমের উপরে। মূলত চা শিল্পের সাথেই সরকারী হিসেবে সাড়ে চার লক্ষ চা-শ্রমিক নিযুক্ত আছেন। টেম্পোরারি শ্রমিকের সংখ্যা ধরলে তা প্রায় ১০ লক্ষ। এছাড়া রয়েছে নতুন করে গড়ে ওঠা অজস্র ছোট ছোট চা বাগান, যা কোচবিহার থেকে শুরু করে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই নতুন গড়ে ওঠা চা বাগান মূলত কৃষি জমির উপরে গড়ে উঠেছে। এই সময়কালে **প্রায় ৮৭ হাজার হেক্টর কৃষি জমি চা বাগানে পরিণত হয়েছে। এই জমিগুলি মূলত রাজবংশী আদিবাসী এবং গরিব প্রান্তিক মুসলমানদের জমিতে গড়ে উঠেছে। গ্রামীণ একশ্রেণীর নব্য ধনী এই জমিগুলি জলের দরে কিনে চা বাগান গড়েছে।** নামমাত্র দাম দেওয়া হয়েছে জমির মালিকদের এবং একর পিছু একজন করে কাজ দেওয়া হয়েছে। এইভাবে একজন স্বাধীন কৃষক শুধু বারোমাস কাজ পাবার আশায় পরাধীন শ্রমিকে পরিণত হয়েছেন। নতুন করে গড়ে ওঠা চা বাগানগুলিতে আজ প্রায় ৫০ শতাংশের উপরে চা উৎপাদিত হচ্ছে, কিন্তু এই ছোট ছোট চা বাগানগুলিতে কোনও শ্রম আইনই কার্যকরী নয়। তাই লড়াই চলছে এই সব জায়গাতেও।

কিন্তু এর পরেও বাধ্য হয়ে শ্রমিকেরা রাজ্য ছাড়ছেন জীবিকার সন্ধানে। দেশের বাইরে ১৭টা দেশে যেমন পাড়ি জমাচ্ছেন, তেমনই দেশের মধ্যেও বিভিন্ন রাজ্যে তাঁরা ছড়িয়ে পড়ছেন মাতৃভূমি পরিত্যাগ করে এবং এ ক্ষেত্রে তাঁদের প্রধান গন্তব্য কেরালা। মুম্বইভিত্তিক সংস্থা 'India Migrants Now' একটি 'আন্তঃরাজ্য মাইগ্রান্ট নীতি সূচক' প্রকাশ করেছিল ২০১৯ সালে, যা কেরালাকে প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য সর্বাধিক অনুকূল বলে দাবি করে। শুধু সর্বোচ্চ মজুরি নয়, সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা দেবার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ রাজ্য এই কেরালা। এর জন্যে সরকারের সদিচ্ছা আর নীতির প্রয়োজন। বাম সরকার কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে এই অংশের শ্রমজীবী মানুষকে দেখে, তার প্রমাণ এটাই। তালিকায় এর পরেই রয়েছে মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাব। শ্রমিকদের উপর শোষণ ও আর্থিক বৈষম্যের দায়ে অধিকাংশ রাজ্যকেই এই রিপোর্ট অভিযুক্ত করেছে। সেখানে না আছে কাজের স্থায়ী চুক্তি, না আছে স্বাস্থ্য-শিক্ষার নিরাপত্তা কিংবা নাগরিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুযোগ। এদের মধ্যে সবথেকে খারাপ হাল যে রাজ্যগুলিতে, গুজরাট তাদের মধ্যে অন্যতম। গুজরাটে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য শুধুমাত্র বিশ্রামাগার ও স্থায়ী আবাসস্থলের আশ্বাস দেওয়া হয়। তারও সঠিক বাস্তবায়নের কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই সে-রাজ্যে। কিন্তু কেরালার মতো একটা বাম শাসিত রাজ্যে শ্রমিকদের কল্যাণের জন্যে কতদূর করা যায়, তার উদাহরণ সর্বত্র পাওয়া যাবে। সব ধরনের শ্রমিক এবং অসংগঠিত অংশের শ্রমিকের মজুরি এবং জীবনধারণের সব সুযোগ-সুবিধা কেরালার সরকার ব্যাপক হারে বাড়িয়েছে, যা সারা দেশে বিরল। যে-কোনও ক্ষেত্রেই কেরালায় সরকার নির্ধারিত দৈনিক মজুরি দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। ২০২১-২২ সালে সেখানে গ্রামাঞ্চলে কৃষি-মজুরি নির্ধারিত হয়েছিল ৭২৬ টাকা ৮০ পয়সা (এ রাজ্যে ৩০৫ টাকা ৮৩ পয়সা) আর নির্মাণ শ্রমিকদের জন্যে নির্ধারিত ছিল ৮৩৭ টাকা ৭০ পয়সা (এ রাজ্যে ৩৩৩ টাকা ৪০ পয়াসা) এবং শুধু নির্ধারণ করেই দায় সারা নয়, সরকার সেখানে রীতিমতো নজর রাখে মজুরি প্রদানের বিষয়টিতে। মজুরির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ভেদাভেদ যাতে না ঘটে, সেদিকেও নজর রয়েছে সে রাজ্যের সরকারের।

এইখানেই তফাৎ। তফাৎ দৃষ্টিভঙ্গীর। তফাৎ মমত্বের। শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্যে এক বামপন্থী সরকারের যে মমত্ব থাকতে পারে এবং থাকে, একটা দক্ষিণপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন সরকারের সেটা থাকতে পারে না। তার শ্রেণীগত অবস্থানের জন্যেই সেটা থাকতে পারে না। সুতরাং সব দিক বিচার করেই আগামী দিনে আমাদের নিয়োগ কর্তা নির্বাচনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। এই মুহূর্তে চাই বা না চাই, যে রণাঙ্গণে আমরা আছি, সেখানে ভুলচুকের কোনও অবকাশ নেই। □

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

কর্মচারী স্বার্থে...

পার্মানেন্ট পদে রিটায়ার করে যেতেন, ফলে তাঁরা আর পেনশন পেতেন না।

কিন্তু এই আদেশনামায় বলা হয় যে, একজন কর্মচারী তাঁর কর্মচারী জীবনের প্রথম ২ বছর টেম্পোরারি পদে থাকবেন, তারপর এক বছর প্রোবেশনে থাকবেন এবং ৩ বছর পরে স্থায়ী হবেন। ফলে প্রতি কর্মচারীর জন্যই পেনশনের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

৩। No. 3868-F dt. 31.03.1984

এই আদেশনামা দ্বারা অফিসগুলিতে UDA / UDC পদ বৃদ্ধি করে LDA/LDC এবং UDA/UDC—এদের অনুপাত ১ ঃ ১ করা হয়।

৪। No. 6075-F dt. 21.06.1990

তৃতীয় রোপাতে পদোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধি করতে ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কীম (CAS) লাগু করা হয়।

৫। No. 5225-F dt. 17.05.1995

এই আদেশনামার পূর্ববর্তী সময়ে একজন কর্মচারী বিভিন্ন পদে পদোন্নতি পেলে, প্রতি পদোন্নতির পদেই তাঁকে কনফার্ম হতে হত। পদ না থাকলে পদোন্নতির পদে কনফার্ম হওয়া যেত না। ফলে ওই পদের পেনশনারি বেনিফিট পাওয়া যেত না। এই আদেশনামায় বলা হয় যে কর্মচারী তাঁর প্রথম পদে 'কনফার্ম' হলেই পরবর্তী সব পদে 'কনফার্ম' বলে স্বীকৃত হবেন। এর ফলে পদোন্নতি প্রাপ্ত পদে অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা পেতে আর অসুবিধায় পড়তে হবে না।

৬। পে কমিশন ঃ

বামফ্রন্ট আমলে ৪টি পে কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল এবং তার মধ্য দিয়ে কর্মচারী সমাজ বিপুল আর্থিক সুবিধাপ্রাপ্ত হয়। বেতন স্কেলের সংখ্যা কমানো, সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ বেতনের অনুপাত কমানো, নীচের বেতনক্রমগুলি উন্নতিসাধন করা—ইত্যাদি কর্মচারী স্বার্থে বহু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

এই সময়কালে বামফ্রন্ট সরকারের পঞ্চম বেতন কমিশন আলোচনার শীর্ষে এসেছে, 'এরিয়ার ডি.এ.'-কে কেন্দ্র করে মামলায় জয়ের প্রধান ভিত্তি প্রস্তর হয়ে ওঠার জন্য। পঞ্চম রোপার ক্লারিফিকেটরি মেমোরানডাম 1691-F, তাং 23/02/2009-এ ডি.এ. সম্পর্কে বলা হয় যে—Consequent upon revision of pay of Govt. Employees in accordance with the West Bengal Services (Revision of Pay and Allowances) Rules, 2009, the dearness allowance to which a Government employee is entitled from time to time since the 1st day of January, 2006 needs to be related to pay in the revised pay structure.

পঞ্চম বেতন কমিশনের মহার্ঘভাতা সম্পর্কে এই বক্তব্যই সুপ্রিম কোর্টে ডি.এ. সংক্রান্ত লড়াইকে জয়যুক্ত করেছে।

৭। No. 7287-F dt. 19.09.2008—West Bengal Health Scheme, 2008

কর্মচারী স্বার্থে বামফ্রন্ট সরকারের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আদেশনামাগুলির মধ্যে অন্যতম হল WBHS বিষয়ক আদেশনামাটি। কর্মচারী স্বাস্থ্য সংক্রান্ত দুর্ভাবনা দূর করবার ক্ষেত্রে এই আদেশনামাটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কর্মচারী ও তার পরিবারের সদস্যদের পশ্চিমবঙ্গের সরকারী ও বেসরকারী সব ধরনের হাসপাতালে ইনডোর ও আউটডোর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

বর্তমান সরকারের আমলে কর্মচারী স্বার্থবিরোধী আদেশনামা

১। No. 1583-F(P) dt. 21.02.2012

এই আদেশনামা দ্বারা রাজ্য সরকার টাইপিস্ট, ক্লার্ক-কাম-টাইপিস্ট, টাইপিস্ট-কাম-ক্লার্ক, টাইপিস্ট-ক্লার্ক, ক্লার্ক-টাইপিস্ট এই সমস্ত পদগুলি এবং এইসব পদ থেকে পদোন্নতির জন্য যেসব পদগুলি ছিল তার সবকটিকেই 'Dying Cadre'-এ পরিণত করা হয়।

এই আদেশনামায় বলা হয়েছিল যে বেসিক গ্রেডের খালি পদগুলিকে LDA/LDC পদে পরিণত করা হবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা করা হয়নি।

২। No. 1832-F(P) dt. 01.03.2013—West Bengal Services (Appointment, Probation and Absorption of Gr. C Employees) Rules, 2013

অত্যন্ত বিপদজনক এই আদেশনামা চালু হয়েছিল গ্রুপ-সি পদে কর্মচারীদের প্রথম নিয়োগকে কেন্দ্র করে। বলা হয় নিয়োগের পরে গ্রুপ-সি পদে একজন কর্মচারী তিন বছর প্রোবেশনে থাকবে। 'প্রোবেশন' পর্বে প্রতি বছর কর্মচারীর কাজের পর্যালোচনা করে দেখা হবে তা সন্তোষজনক কিনা। কিন্তু কারা, কীভাবে এই পর্যালোচনা করবেন সে বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হয়নি এই আদেশনামায়। ফলে দপ্তরের আমলার হাতেই উঠে আসে কর্মচারীর কাজের স্থায়ী হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি। যা নিশ্চিতভাবেই কর্মচারীর ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে। এই 'প্রোবেশন' পর্বে কর্মচারীরা মহার্ঘভাতা ও বাড়ি ভাড়া ভাতা পেতেন না। এই প্রোবেশনের সময়কাল MCAS পাওয়া পদোন্নতির জন্য বিবেচিত হত না। এই সময়কালে অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের মতো ছুটি পাওয়া যেত না। চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীদের যে ছুটি ছিল তাই শুধু পাওয়া যেত।

৩। 175-F(P) dt. 9.10.2014—Amendments in the West Bengal Service Rules, Part-1

এই আদেশনামা দ্বারা WBSR, Part-1-এর বিভিন্ন ধারা /অধ্যায় সংশোধন করে কর্মচারীদের পাবলিক ইন্টারেস্টের নামে ডেপুটেশন / ডিটেইলমেন্টের মাধ্যমে দূর দূরান্তে অন্যায়ভাবে হয়রানিমূলক বদলি করা হত। এই অস্ত্রটিকে ব্যবহার করা হচ্ছে কর্মচারীদের ভয় দেখানোর জন্য, তাদের নিষ্ক্রিয় করে দেবার জন্য, যাতে তারা ট্রেড ইউনিয়নের কাজে যুক্ত না হয়।

৪। ষষ্ঠ পে-কমিশনের সুপারিশ

ষষ্ঠ বেতন কমিশনের মতো কর্মচারী স্বার্থবিরোধী সুপারিশ আগে কখনো কর্মচারী সমাজ প্রত্যক্ষ করেনি। প্রায় অধিকাংশ সুপারিশই কর্মচারীদের আর্থিক অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এর মধ্যে দুটি সুপারিশ খুবই মারাত্মক। প্রথমটি হলো ন্যূনতম বেতন নির্ধারণের প্রক্রিয়া। এতদিন পর্যাপ্ত অ্যাক্রুয়েড সূত্র দ্বারা একজন কর্মচারী পরিবারের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ করা হত বৈজ্ঞানিকভাবে। কিন্তু ষষ্ঠ বেতন কমিশন এই প্রক্রিয়া বাতিল করে দিয়ে বলেছে যে বিগত দশ বছরে রাজ্যের জনপ্রতি বার্ষিক আয় বৃদ্ধির হিসেব করে ন্যূনতম বেতন নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ বাজারদরের বৃদ্ধি, কর্মচারী পরিবারের চাহিদা ইত্যাদি বিষয়গুলি ন্যূনতম বেতন নির্ধারণে কোনো ভূমিকা নেবে না।

অপর বিষয়টি হলো মহার্ঘভাতা প্রদানে সরকারের ভূমিকা। রিপোর্টের ভলিউম-১, পার্ট-১-এর ১২ নং চ্যাপ্টারে মহার্ঘভাতা নিয়ে কমিশন বলেছে—

In view of the above, the Commission recommends that the State Government may from time to time decide the quantum of Dearness Allowance to be given to the employees taking into consideration the financial resources available to the State Government. The State Government shall not be required to adhere to the prevailing All India Consumer Price Index for the purpose of granting/or fixing and/or enhancing the quantum of Dearness Allowance. অর্থাৎ সরকার তার ইচ্ছেমতো মহার্ঘভাতা দেবে এবং তা AICPI দ্বারা নির্ধারিত হবে না। এই অবস্থান পঞ্চম বেতন কমিশনের ঠিক বিপরীত অবস্থান। □

Editor : SUMAN KANTI NAG
SANGRAMI HATIAR
State Co-ordination Committee
53rd Year, 11-12th Edition, March-April, 2026
Regd. No. : 18484/71

১৫ বছরে রাজ্যে ধ্বংসের মুখে সরকারী জনস্বাস্থ্য পরিষেবা, ফুলেফেঁপে উঠছে বেসরকারী স্বাস্থ্যসেবা

দীপঙ্কর বাগচী

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনায় এক তাৎপর্যপূর্ণ বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়। একদিকে রয়েছে সরকারী প্রচারযন্ত্রকে ব্যবহার করে তৈরী করা এক ঝলমলে বহিরাঙ্গের চিত্র—যেখানে রয়েছে নতুন নতুন স্বাস্থ্য প্রকল্পের ঘোষণা, স্বাস্থ্য বীমা, আধুনিক কাঠামো নির্মাণের গালভরা প্রতিশ্রুতি, কিছুক্ষেত্রে ঝাঁ চকচকে বিল্ডিং ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু উল্টোদিকেই রয়েছে রাজ্যের সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা—যেখানে রয়েছে নিরুপায় মানুষের দীর্ঘ প্রতীক্ষা, অনিশ্চিত পরিষেবা, সরকারী স্বাস্থ্যব্যবস্থায় অপ্রতুল মানবসম্পদ এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে চিকিৎসার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের বাস্তবতা। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এই দুই বিপরীত বাস্তবতা আসলে সরকারের (কেন্দ্র এবং রাজ্য) রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন, যেখানে জনস্বাস্থ্য নামক বিষয়টি, বলা ভালো স্বাস্থ্য পরিষেবা নামক বিষয়টি ক্রমশ সরকার তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে সরে এসে বেসরকারী পুঁজির নিয়ন্ত্রণাধীন এক লাভজনক ক্ষেত্র বা বাজারে পরিণত হচ্ছে।

সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মূল কাঠামো তৈরী হয় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে। বড়োসড়ো বিল্ডিং—সে নীল-সাদাই হোক বা অন্য কোনো রঙের, সেগুলো জরুরি হলেও, পরবর্তী ধাপ। বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী মেডিকেল কলেজ মিলিয়ে রাজ্যে বছরে কয়েক হাজার ডাক্তার তৈরী হচ্ছে। রাজ্যে চিকিৎসকের আকাল, এমন বলার সুযোগ আর নেই। কিন্তু স্থায়ী নিয়োগ না করে কিংবা প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগ না করে সদ্য পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশন পাস করা চিকিৎসকদের বন্ডের মাধ্যমে বাড়তি রেসিডেন্সি/ট্রেনিং-এর মাধ্যমে চিকিৎসকের অভাব পূরণ হচ্ছে। স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগে বিপুল সংখ্যক শূন্যপদ থাকলেও স্থায়ী পদে স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ পর্যাপ্ত নয়। মোটামুটি চুক্তিভিত্তিক কর্মী দিয়েই কাজ চালানো হচ্ছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করে কাজ চলছে। এছাড়া নতুন নতুন মেডিকেল কলেজে নিত্যনতুন টেকনিশিয়ান কোর্স খুলে সেখানে যাঁরা ট্রেনিং নিতে আসছেন, তাঁদের দিয়েই স্থায়ী কর্মীদের কাজ করানো হচ্ছে। এই অবস্থায়, প্রতি ধাপে উপযুক্ত সংখ্যক যোগ্য চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মী না-থাকার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে, স্বাস্থ্য-পরিষেবাই হোক বা জনস্বাস্থ্য, কোনোটিই ঠিকভাবে চলতে পারে না, চলছেও না।

২০১৮ সাল থেকেই রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য বিষয়ক সামগ্রিক তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করা বন্ধ করে দিয়েছে, আর এই একই ধরনের কাজ করেছে দেশের সরকারও। তথ্য গোপনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের প্রয়াসের একটি কদর্য রূপ আমরা দেখতে পেয়েছিলাম কোভিডের দিনগুলোতে। এমনকি দেশের কেন্দ্রীয় সরকারও যথাসাধ্য তথ্য গোপন করে গেছে কোভিড-পরিস্থিতি বিষয়ে। নিয়োগ দুর্নীতি, সিন্ডিকেট রাজ রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির নগ্নরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ঘটনায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ২০১১ সালের সেনসাসে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মৃত্যুহার ছিল সবচেয়ে কম, জন্মহার নিয়ন্ত্রণের সূচক টোটাল ফার্টিলিটি রেট ছিল দেশের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন, শিশু-মৃত্যুর বিভিন্ন সূচক যেমন নিওন্যাটাল মর্টালিটি রেট, ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট, আন্ডার-ফাইভ মর্টালিটি রেট, তিনটিতেই রাজ্যের স্থান ছিল জাতীয় গড়ের চাইতে ঢের উন্নত। আমরা ছিলাম শ্রেষ্ঠত্বের তালিকায় চার নম্বরে।

বেসরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার তুলনায় সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা দ্বিতীয় শ্রেণীর এই কথাটুকু সর্বসাধারণের মনে গেঁথে দিতে সক্ষম হওয়ার ঠিক পরেই চালু হল স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প। জনসাধারণের করের টাকা ঘুরপথে বেসরকারী মালিকের পকেটে স্থানান্তরিত করার এর চাইতে উপযুক্ত উপায় কল্পনা করা কঠিন। কেন্দ্রের 'আয়ুষ্মান ভারত'-ও একই ব্যাপার। ২০১৬ সালে স্বাস্থ্যসাথী চালু হওয়ার পর থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত সরকারী হাসপাতালে ঢুকেছে ৩১৭ কোটি, অন্যদিকে বেসরকারী হাসপাতালে ঢুকেছে ৩৭৮২ কোটি টাকা—অর্থাৎ প্রায় ১২ গুণ। ভারতে স্বাস্থ্যখাতে সাধারণ মানুষের মোট খরচের প্রায় ৭০% ব্যয় হয় ওষুধ কিনতে। কেন্দ্রের সরকারের নীতির ফলে জীবনদায়ী ওষুধ সহ ওষুধের দাম আজ আকাশছোঁয়া। রাজ্যে মানুষের স্বাস্থ্যব্যয়ের প্রায় ৮০% খরচ হয় মূলত আউটপেশেন্ট বা বহির্বিভাগীয় চিকিৎসায়। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসাথী বা আয়ুষ্মান ভারতের মতো সরকারী বীমানির্ভর প্রকল্পগুলির কোনো সুবিধা সাধারণ মানুষ পায় না।

এর বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে কেরালার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভারতের মধ্যে সেরা এবং বিশ্বমানের জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামোর একটি অনুকরণীয় মডেল, যা কম খরচে উন্নতমানের চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য পরিচিত। এখানে সুদৃঢ় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (PHC) নেটওয়ার্ক এবং বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার কারণে শিশু মৃত্যুহার কম (৩.৪ প্রতি ১০০০) এবং মাতৃমৃত্যুহার (১৯ প্রতি ১,০০,০০০) খুবই কম, যা উন্নত দেশের সমতুল্য। রাজ্যে ৮৮৫টি পরিবার স্বাস্থ্যকেন্দ্র (FHC), ১৫২টি ব্লক পরিবার স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ১৪টি মেডিকেল কলেজ সহ ১২০০-এরও বেশি সরকারী স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আর্দ্রম মিশন (Aardram Mission) প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে আধুনিক পরিবার স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং রোগীদের জন্য উন্নত মানের পরিষেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। 'করুণ্যা আরোগ্য সুরক্ষা পদ্ধতি' (KASP)-এর মাধ্যমে রাজ্যের সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্য বিমা এবং ০-১৮ বছর বয়সী শিশুদের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য 'আরোগ্যকিরণম' প্রকল্প চালানো হয়। উচ্চমানের এবং সাশ্রয়ী চিকিৎসার কারণে কেরালা বর্তমানে হার্ট, ক্যানসার এবং হাড়ের চিকিৎসার জন্য একটি অন্যতম জনপ্রিয় গন্তব্য।

ইতিহাস বলে অতীতে জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে প্রতিটি অগ্রগতি ঘটেছে শাসকের সদিচ্ছায় নয়, ঘটেছে সংগঠিত সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। শ্রমিক, কৃষক, মহিলা, ছাত্র-যুব সংগঠনের লড়াই এবং দীর্ঘ প্রগতিশীল নাগরিক আন্দোলন রাষ্ট্রকে বাধ্য করেছিল স্বাস্থ্যকে একটি জনসেবা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে। আজ আবার সেই সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা সামনে এসেছে। □

কোটি কোটি রোহিঙ্গার আষাঢ়ে গল্প

বঙ্গে এস আই আর শুরুর কারণে রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সহ তাঁর দলের একাধিক নেতা বলতেন, এস আই আর হলে এক কোটির বেশি রোহিঙ্গা ধরা পড়বে। তাদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে। কিন্তু পৃথিবীর বাইরে কি মানুষের আবাস আর এস এস-এর গবেষণাগারে আবিষ্কৃত হয়েছে? রোহিঙ্গারা কি চাঁদে বা মঙ্গলগ্রহে থাকেন? কেন বলছি এই কথা, কারণ, তথ্য বলছে এই মুহূর্তে বিশ্বে কমবেশি ২৭ লক্ষ রোহিঙ্গা আছে। ভারতে থাকতে পারে ৫০ হাজারের মতো। গোটা ভারতেই এই সংখ্যাটা ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে একটা অংশ পশ্চিমবঙ্গে থাকলেও থাকতে পারে। তাহলে কোটি রোহিঙ্গার মিথ্যা প্রচার কেন করা হয়েছিল বিজেপির পক্ষ থেকে? আসলে রোহিঙ্গারা ইসলাম ধর্মাবলম্বী। হিন্দুত্বের রাজনীতির অন্যতম খুঁটি হলো ইসলামোফোবিয়া। এই রোহিঙ্গা প্রজাতির প্রসঙ্গ নিয়ে এসে বিভাজন সৃষ্টি করা। এস আই আর-এ প্রাথমিকভাবে বাদ পড়া এ রাজ্যের প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষের মধ্যে রোহিঙ্গা বা বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীর তথ্য আছে কি? না সেরকম কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তাই গল্পের গরুকে গাছে উঠিয়ে নামিয়ে ফেলতে হয়েছে। □

মানস কুমার বড়ুয়া

দেশে দু'কোটি অনুপ্রবেশের তত্ত্ব

বামফ্রন্ট আমলে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তখন বিরোধী নেত্রী ছিলেন। তখন এম পি হিসাবে সংসদে বামফ্রন্টের ভোটে জেতার কারণ হিসাবে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের তত্ত্ব আওড়াতেন। লোকসভার স্পিকারের চেয়ারের দিকে অনুপ্রবেশের তত্ত্বের প্রমাণ হিসাবে তাঁর কাগজের বান্ডিল ছুঁড়ে মারার দৃশ্য তো ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বর্তমানে তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ বিজেপি যখন করছে, তখন শাসকদলের আর কিছু বলার নেই। বিজেপির বক্তব্য যে এস আই আর হলে নাকি সব ফাঁস হয়ে যাবে। যদিও তা হয়নি।

বাস্তবটা হল বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীর কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যাতত্ত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। কিছুটা মনগড়া ধারণা থেকেই বলা হয় যে ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী ভারতে আছে। যদি সত্যি হয় তাহলে প্রশ্ন হল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর, বি এস এফ তাহলে কী কাজ করছে? দেশভাগের সময় পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা ৫২.৮৩ লক্ষ। ১৯৭৩ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ১ কোটি মানুষ ভারতে আশ্রয় নেয়। এর একটা অংশ পরে ফিরেও যায় নিজ দেশে। দেশভাগের কারণে যাঁরা এদেশে এসেছেন এবং থেকে গেছেন তাঁরা অনুপ্রবেশকারী নন, তাঁরা উদ্বাস্তু। একথা এড়িয়ে যায় বর্তমান কেন্দ্র ও রাজ্যের দুই শাসক।

১৯৫৬ সালে জাতিসংঘের রিফিউজি কনভেনশন এবং ১৯৬৭ সালের প্রোটোকলে ভারত স্বাক্ষর করেনি। ভারতের নির্দিষ্ট কোনো সুস্পষ্ট উদ্বাস্তু নীতি নেই। সুস্পষ্ট উদ্বাস্তু নীতি তৈরীর আন্দোলনে বামপন্থীরা শুরু থেকেই আছে। নেই বিজেপি, তৃণমূল। তাই মূল সমস্যা থেকে নজর ঘোরানোর প্রয়াস। □

মানস কুমার বড়ুয়া

ত্রিপুরার ডবল ইঞ্জিন সরকারের রোজ নামচা

ত্রিপুরা

● ২০১৮ সালে ক্ষমতায় আসার পরে যে সমস্ত আক্রমণ নামিয়েছে—

ডিফাইণ্ড পেনশন স্কীম বন্ধ করে চালু হয়েছে নয়া পেনশন ব্যবস্থা

বছরে ২ কিস্তি মহার্ঘভাতা/ রিলিফ পাওয়ার অধিকার, বর্তমানে বকেয়া মহার্ঘভাতা/ রিলিফের পরিমাণ ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ, প্রতিশ্রুতি ছিল কোনও বকেয়া থাকবেনা ডি এ-র

গ্রুপ সি কর্মচারীদের মেডিক্যাল রিইম্বার্সমেন্ট পাওয়ার সুযোগ বন্ধ

মৃত কর্মচারীর পোষ্যের চাকরির সুযোগ বন্ধ

জন্ম নিয়ন্ত্রণের স্পেশাল ইনক্রিমেন্ট বাতিল

অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করার ৬টি আদেশনামা বাতিল, প্রতিশ্রুতি ছিল প্রত্যেককে নিয়মিত করার।

টি. আর. বি. টি.-র মাধ্যমে বছরে দু'বার চাকরি পাওয়ার সুযোগ বন্ধ, প্রতিশ্রুতি ছিল চাকরির শুরুর দিন থেকে মিলবে নিয়মিত বেতনক্রম।

কর্মচারী ক্ষোভকে রুখতে এসমা জারি করা

ফায়ার সার্ভিসের ক্ষেত্রে সমিতি করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়

৭১টি বিদ্যালয় বন্ধ, ৪৬০টি বিদ্যালয় চলছে ১ জন শিক্ষক দিয়ে

২০১৭ সাল পর্যন্ত কর্মচারী ছিলেন ১,৫৮,২২০ জন, বর্তমানে ৫৬ হাজার কর্মচারী কর্মরত। প্রতিশ্রুতি ছিল বছরে পঞ্চাশ হজার বেকারের চাকরির

বিদ্যালয়ে ড্রপ আউট ৩৭ শতাংশ

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে ডি.এ. প্রদানের তুলনামূলক চিত্র (১ এপ্রিল, ২০২৬)

রাজ্যের নাম	বর্তমান ডি.এ. / ডি.আর.-এর হার
১. অরুণাচল প্রদেশ	৫৮ শতাংশ
২. আসাম	৫৮ শতাংশ
৩. নাগাল্যান্ড	৫৮ শতাংশ
৪. মণিপুর	৩৯ শতাংশ (১.১.২০২৫)
৫. ত্রিপুরা	৪১ শতাংশ
৬. নাগাল্যান্ড	৫৮ শতাংশ
৭. সিকিম	৫৫ শতাংশ
৮. মেঘালয়	৪৬ শতাংশ

বিগত পাঁচ বছরে কলকাতায় পড়ুয়া কমেছে ৫৬ হাজার (বিনা মন্তব্যে)

শিক্ষাবর্ষ	শিক্ষার্থীর সংখ্যা
২০২১-২২	১,৩২,৩৮৯ জন
২০২২-২৩	১,৩৫,৪৮২ জন
২০২৩-২৪	১,০৮,১১৮ জন
২০২৪-২৫	৯২,৫৮৬ জন
২০২৫-২৬	৭৬,৩১২ জন

সম্পাদক ঃ সুমন কান্তি নাগ
সহযোগী সম্পাদক ঃ বিদ্যুত দাস
যোগাযোগ ঃ
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।